'গৃহস্থ'-গ্রন্থাবলী—২

রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী

কলিকাতা,
ষ্টুডেন্ট্‌স্ লাইব্রেরী,
শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট,
১৩২০

মূল্য ॥৵০ দশ আনা

সূচী

‘গৃহস্থ’-গ্রন্থাবলী—২

রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী

কলিকাতা,
ষ্টুডেণ্ট্‌স্‌ লাইব্রেরী,
শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট,
১৩২০

মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা

ইণ্ডিয়া প্রেস
২৪ নং মিডিল রোড, ইটালী, কলিকাতা
প্রিণ্টার—শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু

প্রকাশক
শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
ষ্টুডেণ্ট্স্ লাইব্রেরী
৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

এই রচনা 'গৃহস্থে' বাহির হইয়াছিল—সম্প্রতি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচারিত হইল। রবীন্দ্র-প্রতিভার মূলসূত্র এবং রবীন্দ্র-শিল্পের যথার্থ 'প্রেরণা' বুঝিবার পক্ষে এই গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। ইতি—

১লা ফাল্গুন,
১৩২০ সাল।

প্রকাশক

সূচী

রবীন্দ্র-সাহিত্যে

ভারতের বাণী

রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয়*

"রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মিশনের প্রতিষ্ঠালাভ, বঙ্গসাহিত্যের মর্য্যাদা-বৃদ্ধি, বঙ্গভাষাভাষীর ঐক্যবিধান, তারকনাথ-রাসবিহারীর দান এবং দামোদরের বন্যা—এই কয়েকটি নূতন ঘটনা গত দুই তিন বৎসরের বিশেষ লক্ষণ।" এই সকল ঘটনার ফলে যে যুগের আরম্ভ হইল তাহাকে গত সংখ্যায় আমরা ভারতে "স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় যুগ" নামে অভিহিত করিয়াছি। "সাহিত্যের প্রসার, সেবাধর্ম্মের প্রচার, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠা, দিল্লীতে রাজধানী-প্রবর্ত্তন, বাঙ্গালী জাতির রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে জয়লাভ ইত্যাদি কতিপয় নূতন শক্তি আসিয়া সমাজে দ্বিতীয় যুগের সূত্রপাত করিল। এই নূতন শক্তিপুঞ্জের শেষ নিদর্শন দামোদর বন্যায় দেশবাসীর কার্য্যতৎপরতা। এখন হইতে দ্বিতীয় যুগের নব নব লক্ষণ দেখিতে পাইব।"

বাঙ্গালী জাতির আট বৎসর বয়সে সমগ্র দেশের ভিতর

* 'গৃহস্থ' (অগ্রহায়ণ, ১৩২০) হইতে উদ্ধৃত।

বিশেষ নাড়া দিবার জন্য রুদ্রদেব দামোদরের প্লাবনোপলক্ষ্যে একটা তাণ্ডবের আয়োজন করিয়াছিলেন। তাহার দ্বারা ভারতে নবজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় উন্মুক্ত হইল। অধিকন্তু, দ্বিতীয় যুগের এই আবাহন সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই আমরা একজন বাঙ্গালী সাহিত্যসেবীর বিশ্ব-সাহিত্যে শীর্ষস্থানলাভের সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম। সত্যসত্যই আমরা দ্বিতীয় যুগে প্রবেশ করিয়াছি।

কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত-সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা বাঙ্গালার সাহিত্যসেবীকে "এসিয়ার রাজকবি" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। বঙ্গসরস্বতীর বরপুত্রের যথোচিত সমাদর করা হয় নাই—ইহা বুঝাইবার জন্যই যেন আজ ভারতের রবীন্দ্রনাথকে জগতের একটি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-কলা-সাহিত্য-পরিষৎ ইউরোপের মুখপাত্ররূপে তাঁহাদের সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার * দান করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন। (১৯১৩ সালে পৃথিবীর সাহিত্য-ভাণ্ডারে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পদ বিবেচিত হইয়াছে। এই বৎসরের জন্য বাঙ্গালীর রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-জগতের "একমেবা-দ্বিতীয়ং" জ্ঞানে বিশ্ববাসীর পূজা প্রাপ্ত হইলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই দিগ্বিজয় ভারতের নবযুগে নবীনজাতিগঠনে কতখানি সহায়তা করিবে, আমরা ভবিষ্যতে তাহা আলোচনা করিব। (রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয়ে বাঙ্গালা-সাহিত্য ও ভারতবাসীর চিন্তাশক্তি জগৎকে কি পরিমাণে প্রভাবান্বিত করিবে তাহা অল্পদিনের ভিতরই নিতান্ত অজ্ঞ ও অন্ধ লোকেরাও বুঝিতে

* নোবেল পুরস্কারের মূল্য নগদ ১২০০০০৲ টাকা।

পারিবেন। কতকগুলি ঘটনাচক্রের প্রভাবে হিন্দু চিন্তাবীরকে —একটি ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষার আজীবন সেবককে,—প্রাচ্যজগতের তথা-কথিত অর্দ্ধসভ্যজাতি-প্রসূত মানবসন্তানকে পাশ্চাত্য জগৎ বৈঠকে বসিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সম্মান ও পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কি কি কারণে ইউরোপীয় সুধীবর্গ প্রাচ্যজগতের একজন চিন্তাবীরকে এরূপ সম্বর্দ্ধনা করিয়া সম্মান ও গৌরব বোধ করিলেন, তাহার আলোচনা করিবার জন্য অনতিদূর ভবিষ্যতেই দার্শনিক ও ঐতিহাসিকগণ আগ্রহ সহকারে অগ্রসর হইবেন। অধিকন্তু, ইতিহাস-বিজ্ঞানের কোন্ নিয়মানুসারে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসম্পদই মানবজাতিকে ভারতীয় সাহিত্য ও জীবন-ধারার অন্যান্য বিভাগ বুঝাইবার উপায় ও কেন্দ্রস্বরূপ হইল—তাহার বিশ্লেষণও অল্পকালের ভিতরই দেশ-বিদেশের পণ্ডিত-সমাজে আরব্ধ হইবে।

আমরা এখন বাঙ্গালীকে ও ভারতবাসীকে কয়েকটি কথামাত্র স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি। প্রথমতঃ, এত উচ্চসম্মান-লাভ অন্য কোন এসিয়াবাসীর ভাগ্যে ঘটে নাই—এমন কি জাপানেরও এখন পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি এই দুর্ল্লভ যশঃ-প্রাপ্তির উপযুক্ত বিবেচিত হন নাই। বাঙ্গালীর সম্বর্দ্ধনায় সমগ্র এসিয়াখণ্ডের, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-সভ্যতার উত্তরাধিকারী প্রাচ্য মানবের সম্বর্দ্ধনা হইল। ১৯০৫ সালে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ রুশিয়াকে সম্মুখ-সমরে পরাজিত করিয়া জাপান বিশ্বের রাষ্ট্র-মণ্ডলে এক নব-

বিংশ শতাব্দীরই উদ্বোধন করিয়াছেন। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ জগতের সাহিত্য-সংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইয়া সেই নব-যুগেরই ক্রম-বিকাশে সহায়তা করিলেন। পাশ্চাত্য সমাজে প্রাচ্যপ্রভাব-প্রতিষ্ঠার পথ আরও প্রশস্ত হইল। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দেখিতেছেন যে, জাপানের জয়লাভ এবং রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয় মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাসে তুল্যপ্রভাবসম্পন্ন ও সমগোষ্ঠীভুক্ত—দুই ঘটনা একই শক্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তি—একই ঘটনার বিভিন্ন মূর্ত্তি।

দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় "স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্ত্তি"-রূপে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি ভারতবর্ষের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের উপর বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিলেন। তাহার ফলে মানবজাতি রবীন্দ্র-সাহিত্যকে কেন্দ্র ও পথপ্রদর্শক করিয়া ভারতের আপামর জনসাধারণের যুগযুগান্তরব্যাপী ধর্ম্ম-কর্ম্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, চরিত্র-মনুষ্যত্ব, সভ্যতা-আদর্শ আলোচনা করিতে আরম্ভ করিবে। পরে ক্রমশঃ যখন কথঞ্চিৎ গভীর ও পরিষ্কারভাবে সভ্যজগৎ ভারতবর্ষের বাণী এবং ভারতীয় মর্ম্মকথা বুঝিতে অভ্যস্ত হইয়া ভারতীয় চিন্তাপ্রবাহের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইতে থাকিবে, তখন তাহারা বুঝিবে যে, রত্নপ্রসবিনী ভারতমাতা রবীন্দ্রনাথকে দৈবক্রমে প্রসব করেন নাই, রামমোহন-রাণাডে-দয়ানন্দ-রামতীর্থ-ভূদেব-বঙ্কিম-বিদ্যাসাগরের লীলাভূমি ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের জন্ম আকস্মিক ঘটনা বা প্রকৃতির খেয়াল মাত্র নয়, রবীন্দ্রনাথ আমাদের গরীয়সী জন্মভূমির অসংখ্য বীর

সন্তানের অন্যতম মাত্র—একমেবাদ্বিতীয়ং নহেন। তখন তাহারা নবযুগের প্রবর্ত্তক বিবেকানন্দের ধর্ম্মপ্রচারের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে,—তখন তাহাদের ধারণা জন্মিবে যে, "বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ সকলেই একভাবের ভাবুক, একই মন্ত্রের দ্রষ্টা, একই বাণীর প্রচারক। ভারতবাসীর ইউরোপ-বিজয়ের ইঁহারাই প্রথম সেনাপতি।" তখন তাহারা সত্য-সত্যই বুঝিতে পারিবে—কেন ভারতের অমরকবি দ্বিজেন্দ্রলাল—

"একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়।
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়॥
সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ॥"

—এই গান গাহিয়া নব্যবঙ্গকে বঙ্গজননীর প্রকৃত মূর্ত্তির ধ্যান করিতে শিখাইয়াছেন। তখন চিন্তা-জগতের পক্ষপাতদোষশূন্য সমদর্শী ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, বাঙ্গালার উদীয়মান শিশুকবি সত্যেন্দ্রনাথের—

"বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি।

* * *

একহাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে।
চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।

* * * *

কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষ শাতন করি'
বাঙ্গালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি।

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে 'বরভূধরে'র ভিত্তি,
শ্যামরাজ্যেতে 'ওঙ্কার-ধাম'—মোদেরি প্রাচীন কীর্ত্তি।
মন্বন্তরে মরিনি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিষে অমৃতের টীকা পরি'।

* * * *

দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি' আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদের এই কুটিরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি।

* * *

বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগতময়,—
বাঙ্গালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।
তপের প্রভাবে বাঙ্গালী সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা শব-সাধনের বাড়া।
বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙ্গালী দিয়েছে বিয়া
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।
বাঙ্গালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
বিফল নহে এ বাঙ্গালী জনম, বিফল নহে এ প্রাণ।
ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা-ভরা আহ্লাদে,
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙ্গালী ধাতার আশীর্ব্বাদে।

* * * *

অতীতে যাহার হয়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
বিধাতা'র বরে ভরিবে ভুবন বাঙ্গালীর গৌরবে।'

—ইত্যাদি জাতীয় গৌরবদৃপ্ত উচ্ছ্বাসবাণীর অভ্যন্তরে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নাই।

তৃতীয়তঃ,—রবীন্দ্রনাথ চিরকাল বঙ্গভাষারই সেবা করিয়াছেন। বঙ্গসরস্বতী তাঁহার এই একনিষ্ঠ সাধকের সম্বর্দ্ধনায় বজ্র নিনাদে দেশবাসীকে অভয়বাণী প্রচার করিতেছেন ঃ—"যে ভাষায় গান গাহিয়া, কবিতা লিখিয়া, প্রবন্ধ পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিজয়ী বীর হইতে পারিলেন, যে ভাষার অনুবাদ মাত্র পাইয়া জগৎ নবভাবে অনুপ্রাণিত হইল, সেই ভাষা আর বেশী দিন সরকারী শিক্ষাবিভাগের বিধানে দেশবাসীর দ্বিতীয় ভাষা মাত্র থাকিবে না। বাঙ্গালীর মাতৃভাষায় অত্যুচ্চ বিজ্ঞান, অত্যুচ্চ দর্শন, অত্যুচ্চ ইতিহাস রচিত হইতে পারে কি না, এবিষয়ে যাঁহারা সন্দেহ করিবেন, তাঁহারা জগতের পণ্ডিত-সমাজে পাগল বলিয়া পরিচিত হইবেন। সুতরাং অল্পকালের ভিতরই দেশীয় সন্তান-সন্ততির সর্ব্বোচ্চ শিক্ষাপ্রদানের জন্য তাহাদের মাতৃভাষার সাহায্যই গ্রহণ করা হইবে। বিদেশীয় ভাষাগুলিকে শিক্ষার ব্যবস্থায় দ্বিতীয় স্থান প্রদান করিয়া ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্বাভাবিক ও 'জাতীয়' পদবাচ্য হইয়া উঠিবে। সুযোগ, সুবিধা ও উৎসাহের অভাবে দেশীয় জনসাধারণের মাতৃভাষা তাহার অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য্য ও সামর্থ্য প্রকটিত করিতে পারিতেছে না। অচিরেই সেই সকল অভাব ও বিঘ্ন মোচন করিবার যথোচিত ব্যবস্থা হইবে। ভারতবর্ষের মাতৃভাষাগুলি ও প্রাদেশিক সাহিত্যসমূহ অতি সত্বরেই শিক্ষার ব্যবস্থায় তাহাদের প্রকৃত মর্য্যাদা লাভ করিয়া নানা উপায়ে ভারতবাসীর মনুষ্যত্ব-গঠনের সহায় হইবে।"

কাব্য-রচনা ও স্বদেশ-সেবা *

রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয়ে বাঙ্গালী জাতি বোলপুরে যাইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল। এই সম্বর্দ্ধনায় রবিবাবু যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা সোজা-সোজি বুঝা কঠিন। তাঁহার অভিভাষণ নানা লোকে নানা অর্থে গ্রহণ করিবে। বিশেষতঃ, কবিবরের ভাষা স্বভাবতই অলঙ্কারপূর্ণ, তলাইয়া বুঝিয়া মর্ম্ম-গ্রহণ করিবার ক্ষমতা অনেক লোকেরই নাই। আমরা তাঁহার উক্তির দুই-এক স্থলের যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করিতেছি।

প্রথমতঃ, কবি ও স্বদেশ-সেবক, সাহিত্যসেবী ও কর্ম্মবীর, লেখক ও কর্ম্মী, চিন্তাপ্রচারক ও কর্ম্ম-কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠাতা, পণ্ডিত ও পরোপকারী, বিদ্বান্ ও সাধক,—তিনি এই দুই প্রকার লোকের পার্থক্য কথঞ্চিৎ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি যাহা ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা চরম কথার বীজ তুল্য—দেশবাসীর প্রণিধানের যোগ্য—আমাদের উদীয়মান ছাত্র ও যুবক-সমাজের সর্ব্বদা স্মরণীয় উপদেশ—সাহিত্য-সমালোচকগণের পক্ষে একটি প্রাথমিক সূত্রস্বরূপ। তাঁহার মর্ম্মকথা এই যে, যিনি কবি, সাহিত্যসেবী, লেখক, চিন্তাপ্রচারক, পণ্ডিত বা বিদ্বান্ তাঁহাকে স্বদেশসেবক, কর্ম্মবীর, কর্ম্মী, কর্ম্মকেন্দ্র-প্রতিষ্ঠাতা,

* "গৃহস্থ" (পৌষ ১৩২০) হইতে উদ্ধৃত।

কর্ম্মযোগী, পরোপকারী বা সাধকের মাপকাঠিতে বিচার বা সমালোচনা করা উচিত নয়। এই দুই শ্রেণীর লোক দুই ভিন্ন ভিন্ন জগতে বাস করেন—তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে হইলে এই দুই স্বতন্ত্র জগতের নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি ভুলিয়া গেলে চলিবে না।

খুলিয়া বলিলে আরও বিশদ হইবে। কথাটা বড়ই প্রয়োজনীয়। আমরা জাতীয় জীবনের যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি সে অবস্থায় সমালোচনা সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই স্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ একটি অতি সময়োপযোগী কথা উত্থাপন করিয়াছেন—এজন্য একটুকু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতেছি।

কবি স্বদেশ-সেবক কি না, এ কথা জিজ্ঞাসা করিও না; সাহিত্য-সেবী কর্ম্মবীর কি না এ প্রশ্ন তুলিও না; লেখক স্বয়ং কর্ম্মী কি না তাহা জানিবার জন্য উদ্গ্রীব হইও না। চিন্তা-প্রচারক নিজে কোন কর্ম্মকেন্দ্রের পরিচালক বা প্রবর্ত্তক কি না, তাঁহার চিন্তা বুঝিবার জন্য এ সংবাদ সংগ্রহ করিও না। যিনি ভাবুক, তিনিই আবার কর্ম্মযোগী কি না, যিনি পণ্ডিত, তিনিই আবার পরোপকারী কি না, যিনি বিদ্বান্ তিনিই জীবনের প্রতিকর্ম্মে তাঁহার জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিতেছেন কি না—এ সকল প্রশ্ন অবান্তর মাত্র।

এক ব্যক্তি দুই প্রকার গুণেরই অধিকারী হইতে পারেন না, তাহা নহে। যিনি কবি তিনি স্বদেশ-সেবক হইতেও পারেন,

না-ও হইতে পারেন। যদি স্বদেশসেবক হ'ন, ভালই, না হ'ন ক্ষতি নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার কাব্য উপেক্ষিত হইবে না। কবির জীবন-বৃত্তান্ত হইতে তাঁহার পরোপকারের বা স্বদেশসেবার প্রমাণ বা অ-প্রমাণগুলি টানিয়া বাহির করিলে তাঁহার কাব্য বুঝিবার পক্ষে বিশেষ কোন সুবিধা হইবে না। এই সকল তথ্য জানিলে বা না জানিলে যেটুকু সুবিধা বা অসুবিধা হইবে তাহার দ্বারা কাব্য বা কবির মূল্য বাড়িবে বা কমিবে না। নূতন কতকগুলি কথা জানিতে পাইয়া পাঠক কবিকে নূতন -একদিক হইতে— চিনিতে পারিবেন মাত্র—তাঁহার নূতন এক ব্যক্তিত্ব বুঝিতে পারিবেন মাত্র—তাঁহার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কয়েকটি নূতন পরিচয় পাইবেন মাত্র—এই নূতন জগৎ কবির কাব্যের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে আমরা তাহা জানিতে পারিব মাত্র।

কিন্তু তাহার সাহায্যে কাব্য-হিসাবে, সাহিত্য-হিসাবে, পাণ্ডিত্য-হিসাবে, চিন্তা-হিসাবে, রচনা-হিসাবে এবং ভাব-হিসাবে আমরা লেখকের লেখা হইতে, বক্তার বক্তৃতা হইতে আমাদের জীবন-গঠনোপযোগী নূতন কোন তত্ত্ব পাইব না। কবিকে স্বদেশ-সেবক অথবা স্বদেশ-দ্রোহী, পরোপকারী অথবা স্বার্থপর, ধার্ম্মিক অথবা পাপাত্মা, বৈরাগী অথবা ভোগী, অকপট অথবা কপট ইত্যাদিরূপে আবিষ্কার করিব মাত্র। তাহাতে সমাজের স্বদেশ-সেবক, পরোপকারী, সাধক অথবা স্বার্থপর, স্বদেশদ্রোহী, অধার্ম্মিক, এবং মর্কট-বৈরাগ্য-অবলম্বনকারীর সংখ্যা বাড়িবে বা কমিবে মাত্র। কিন্তু কবি, লেখক, সাহিত্যসেবী, পণ্ডিত, বিদ্বান্

অথবা অ-কবি, অ-লেখক, মূর্খ, অশিক্ষিত ইত্যাদির সংখ্যা কিছুমাত্র বাড়িবে বা কমিবে না। তাহাতে আমাদের উত্তম, মধ্যম বা অধম কাব্যের, সাহিত্যের, রচনার, পাণ্ডিত্যের ও বিদ্যাবত্তার পরিমাণ 'যথাপূর্ব্বং তথা পরং'ই থাকিবে।

সোজা কথা এই, জীবনের প্রতিদিনকার কর্ম্মের সঙ্গে মিলাইয়া লেখকের, চিন্তা-বীরের, সাহিত্যসেবীর রচনা, চিন্তা ও কাব্য বুঝিতে বসিও না। কবি যখন কবিত্ব ত্যাগ করিয়া নূতন আকারে তোমাদের সম্মুখে দেখা দিবেন, সাহিত্যসেবী যখন কর্ম্মজগতের আসরে নামিয়া দশে পাঁচে মিলিয়া কর্ম্ম-কেন্দ্র গঠন করিতে অগ্রসর হইবেন, পণ্ডিত যখন মানবসেবার ধ্বজা লইয়া সকলকে পরোপকারের কর্ম্মে ব্রতী করিবেন, বিদ্বান্ যখন বৈরাগ্য-ব্রত উদ্‌যাপন করিবার জন্য নূতন ব্যক্তিত্ব লইয়া নূতন আকারে মূর্ত্তিমান্ ত্যাগ-ধর্ম্মরূপে তোমাদিগকে আহ্বান করিবেন—তখন তাঁহার জীবন-সংবাদ লইও, তখন তাঁহার কপটতা-অকপটতার হিসাব গ্রহণ করিও, চরিত্রবত্তা-অচরিত্রবত্তার প্রমাণগুলি বাহির করিও, তাঁহার নিকট হইতে স্বদেশ-সেবার "সার্টিফিকেট" আদায় করিও, লোকসমাজ তাঁহাকে কবে কোথায় কি ভাবে দেখিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিও। কিন্তু সাবধান তখন আবার তাঁহার সাহিত্য-সেবার পরিচয় লইও না, তাঁহার কবিতায় কোন্ কোন্ রস ছড়ান আছে তাহা জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইও না; তাঁহার পাণ্ডিত্যের দৌড় কতদূর বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ক্যালেণ্ডার খুঁজিয়া তাহা জানিবার জন্য লালায়িত হইও

না, তাঁহার নামের আগে ও পরে কতখানি ডিগ্রী, উপাধি, টিকি বা ল্যাজ সংযুক্ত আছে তাহার সংখ্যা বা ওজন করিও না।

পাণ্ডিত্য না থাকিলেও পরোপকারী হওয়া যায়—বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর অধিকারী না হইলেও স্বদেশসেবা করা যায়—সাহিত্য-সংসারে নামজাদা লোক না হইয়াও জগৎকে স্তম্ভিত করা যায়—নিতান্ত অ-কবি, অ-বিদ্বান্ এবং অশিক্ষিত হইলেও কর্ম্মবীর, কর্ম্মী, সাধক, কর্ম্মযোগী, পরোপকারী, লোকহিতৈষী, মানবসেবক, ধর্ম্মাত্মা, ধর্ম্মপ্রচারক হইবার কোন বাধা হয় না। সুতরাং স্বদেশ-সেবক বা কর্ম্মবীরের নিকট হইতে তাঁহার "পাশে"র, "উপাধি"র, কাব্যরচনার, পুস্তক মুখস্থ করার, বৈজ্ঞানিক-অনুসন্ধানের, ঐতিহাসিক গবেষণার, বই লিখিবার—সার্টিফিকেট আদায় করিতে যত্নবান্ হইও না। যদি স্বদেশ-সেবকের এই সকল গুণ থাকে, ভালই; কিন্তু এই সব নূতন জগতের নব নব গুণ না থাকিলেও "বয়ে গেল," বড় বেশী আসে যায় না। এই কারণেই স্বদেশ-সেবা-হিসাবে, পরোপকার-হিসাবে, বৈরাগ্য-হিসাবে, ধর্ম্মপ্রাণতা-হিসাবে, তাঁহার কার্য্যাবলীর মূল্য বাড়িবে বা কমিবে না। মূর্খের বৈরাগ্য যে বৈরাগ্য, বিদ্বানের বৈরাগ্যও ঠিক সেই বৈরাগ্য। পণ্ডিতের পরোপকারের যে মূল্য, অপণ্ডিতের পরোপকারেরও ঠিক সেই মূল্য; অশিক্ষিতের স্বদেশ-সেবার যে মাহাত্ম্য, শিক্ষিত সাহিত্যবীরের স্বদেশসেবা তদপেক্ষা এক চুলও বেশী মূল্যবান্ নহে।

কাব্য যিনিই রচনা করুন তাহা কাব্যই বটে। স্বদেশ-সেবা

যিনিই করুন তাহা স্বদেশ-সেবাই বটে। বক্তৃতা যিনিই করুন তাহা বক্তৃতা, সাহিত্য যিনিই সৃষ্টি করুন তাহা সাহিত্য ; আবার পরোপকার যাঁহার দ্বারাই অনুষ্ঠিত হউক, তাহা পরোপকার। বৈরাগ্য যিনিই অবলম্বন করুন তাহা বৈরাগ্য। সুতরাং, প্রথমতঃ, কোন সাহিত্য-সেবীর কাব্য সমালোচনা করিবার সময় অবান্তর কথা আনিও না ; দ্বিতীয়তঃ, কোন ব্যক্তির স্বদেশ-সেবার যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া বাজে কথা তুলিও না।

তবে কি কবি বা চিন্তাপ্রচারক বা লেখকগণ স্বদেশসেবক, পরোপকারী, কর্ম্ম-কর্ত্তা ইত্যাদি হইতে পারেন না ? এই দুই প্রকার গুণের অধিকারী কি একই ব্যক্তি হইতে পারেন না ? আর, স্বদেশ-সেবক বা পরোপকারী বা সন্ন্যাসিগণ কি পণ্ডিত, লেখক, কবি বা বিদ্বান্ হইতে পারেন না ? এই দুই প্রকার গুণের মধ্যে কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে কি ?

দ্বিবিধগুণের যেখানে সমাবেশ সেখানে মণিকাঞ্চন-যোগ হইয়াছে বলিব—সেখানে এক নূতন প্রকারের ব্যক্তিত্বই গঠিত হইয়াছে জানিব। সেখানে সোনাতে সোহাগা দিয়া নূতন এক জীবের সৃষ্টি হইয়াছে বুঝিব। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এই মণিকাঞ্চন-সংযোগে, এই নূতন ব্যক্তিত্ব-সৃষ্টির ফলে আমরা সমাজের নূতন শ্রেণীর কতকগুলি বীরপদবাচ্য লোক পাইব মাত্র, নূতন এক রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইব। তাহার দ্বারা সাধারণ সাহিত্যসেবার কিম্বা সাধারণ স্বদেশসেবার সমালোচনা সম্বন্ধে বিশেষ কোন সুবিধা হইবে না।

প্রকৃত প্রস্তাবে, এরূপ গুণ-সমাবেশ—এরূপ মণিকাঞ্চন-যোগ আলোচনা করিবার সাধারণতঃ প্রয়োজন হয় না। আমরা সম্প্রতি যে কথার মীমাংসা করিতে বসিয়াছি তাহার জন্য এই প্রশ্ন উত্থাপনের কোন আবশ্যকতা নাই। এরূপ "সোনায় সোহাগা" জগতে দেখা যায় কি না—এই সংযোগ বিরল বা অবিরল, তাহাও আমাদের এখানে একেবারেই বিবেচ্য নয়।

গ্রীকসাহিত্যে ইস্কীলাস্, সফক্লীস্ ও ইউরিপিডিস্ যে স্থান অধিকার করিতেছেন তাহা বুঝিবার জন্য আমরা কোন্ কোন্ সংবাদ লইয়া থাকি? গ্রীক-সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস ব্যতীত আর কোন কথা মনে রাখা আবশ্যক কি? এজন্য গ্রীকজাতি সম্বন্ধে সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ছাড়া রাষ্ট্রীয়জীবনের কথা, আচার-ব্যবহারের কথা, নৈতিক অবস্থার কথা ইত্যাদি আরও অনেক কথা জানিতে হয় বটে—কিন্তু কি জন্য? তাহার দ্বারা এই গায়ক, লেখক ও নাট্যকারগণের গ্রন্থগুলি সরসভাবে সজীবভাবে বুঝিবার জন্য। এই সাহিত্যের লেখকগণকে মনুষ্যত্ব-হিসাবে, স্বদেশসেবক-হিসাবে, চরিত্রবত্তার হিসাবে বড়, মহনীয় বা পূজ্য করিবার জন্য নয়। আমরা ইতিহাস ঘাঁটিয়া জানিতে পারি যে, স্বদেশ-উদ্ধারের জন্য ইঁহারা কেহ কেহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন কেহ কেহ এ সম্বন্ধে পরাঙ্মুখ ছিলেন, রাষ্ট্রের উন্নতি বিধানের জন্য কেহ কেহ যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেন অথবা উদাসীন থাকিতেন, কেহ সমাজের, শিল্পের এবং গ্রীক সভ্যতার অন্যান্য বিভাগের পুষ্টির জন্য কথঞ্চিৎ শক্তি ব্যয় করিয়াছিলেন, কেহ বা করেন নাই।

এইরূপে তাঁহাদের বহুমুখীন জীবনের এক একটা চিত্র আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাঁহাদের জীবনের মূলমন্ত্র কয়েকটী জানিতে পারি এবং তাঁহাদিগকে নূতন কারণে স্মরণীয় বা অস্মরণীয় মনে করি। কিন্তু তাহার দ্বারা তাঁহাদের রচিত গ্রন্থগুলি আমাদের কাব্য-সমালোচনার কষ্টিপাথরে বেশী উজ্জ্বল বা অনুজ্জ্বল হইয়া পড়ে কি ?

ইতিহাসপাঠের ফলে সাহিত্য-সমালোচনার আসরে এই টুকুমাত্র লাভ হয় যে, কতকগুলি সাময়িক ঘটনা জানিতে পারিয়া লেখকদিগের ভাষানিবদ্ধ বাক্যগুলির প্রকৃত অর্থ কথঞ্চিৎ বেশী পরিস্ফুট হয়। তাহা ছাড়া আর কিছু নয়। প্লেটো, য়্যারিষ্টটল, কালিদাস, দান্তে, গেটে, সেক্সপীয়র—ইঁহাদের রচনাবলী সম্বন্ধেও সেই কথা। আমরা জিজ্ঞাসা করি না—প্লেটো কেতাবে যে আদর্শ লিখিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে যাইয়া 'ফেল' মারিয়াছিলেন কি না, য়্যারিষ্টটলের সঙ্গে আলেক্-জাণ্ডারের সৌহার্দ্দ্য কত দিন ছিল, দান্তে ইতালীর খণ্ডরাজ্যগুলি যুক্ত-রাজ্যে পরিণত করিবার জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন কি না, কালিদাস বিক্রমাদিত্যের নিকট কত 'পেন্‌শান' বা 'বৃত্তি' পাইতেন, গেটে নেপোলিয়নের পরাক্রম হইতে জার্ম্মাণির উদ্ধার-সাধন নিজ জীবনের কর্ত্তব্য মনে করিতেন কি না, সেক্সপীয়রের সঙ্গে রাণী এলিজাবেথের সম্বন্ধ কিরূপ ছিল। যদি সাহিত্যসেবীদিগের জীবন-বৃত্তান্ত-সম্পর্কিত এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করি, তবে তাহার দ্বারা তাঁহাদের রচনাগুলি সেই সময়কার

অবস্থানুসারে বুঝিবার জন্য—তলাইয়া মজাইয়া দেখিবার জন্য আমাদের একমাত্র চেষ্টা থাকে। ইঁহাদের মধ্যে কেহ নিষ্কর্ম্মা ছিলেন, কেহ বা স্বদেশদ্রোহী ছিলেন, কেহ প্রকৃত দেশভক্ত ছিলেন, কেহ বা স্বার্থসিদ্ধির কথাই ভাবিতেন—এ সকল কথা আমরা জানি ; কিন্তু তাহার জন্য য়্যাণ্টিগোনি, ক্লাউড্‌স্‌, রিপব্লিক, ডিভাইন কমেডি, রঘুবংশ, ফৌষ্ট বা কিংলীয়ারকে স্বর্গে তুলি না অথবা রসাতলে পাঠাই না ! পৃথিবীর মহাপুরুষ, চরিত্রবান্, ধর্ম্মবীর, স্বদেশসেবক ইত্যাদির তালিকায় ইঁহাদের কাহাকেও স্থান দিয়া থাকি, কাহাকে বা দিই না এই পর্য্যন্ত। কিন্তু জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবার ও সাহিত্য-রথীদিগের তালিকায় ইঁহারা অমররূপে বন্দনীয়।

এই সুবিস্তৃত আলোচনায় আমরা বুঝিলাম :—

(১) ধার্ম্মিক, বৈরাগী, কর্ম্মবীর, সাধক, স্বদেশসেবক, পরোপকারী ইত্যাদি না হইয়া কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, কর্ম্মযোগ, সাধনা, স্বদেশসেবা, পরোপকার ইত্যাদি বিষয়ে (ক) অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, সাহিত্য ইত্যাদি রচনা করিতে পারেন ;— আবার (খ) অতি নিকৃষ্ট সাহিত্যও রচনা করিতে পারেন।

(২) ধার্ম্মিক, বৈরাগী ইত্যাদি হইয়া কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ইত্যাদি বিষয়ে (ক) অতি নিকৃষ্ট কাব্য, সাহিত্য ইত্যাদি রচনা করিতে পারেন আবার (খ) অতি উৎকৃষ্ট সাহিত্যও রচনা করিতে পারেন।

এখন উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট কাব্য, সাহিত্য ইত্যাদি কাহাকে বলে সে প্রশ্নের মীমাংসা করিবার প্রয়োজন নাই। সাহিত্যের

আদর্শ কি, কোন্ কোন্ উপাদানে উন্নত কাব্যের সৃষ্টি হয়—এই সকল কথা এ স্থলে আলোচ্য নয়।

অধিকন্তু,—

(১) উৎকৃষ্ট বিদ্বান্, পণ্ডিত, চিন্তাবীর, কবি, সাহিত্যসেবী ইত্যাদি না হইয়া কোন ব্যক্তি (ক) ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, কর্ম্মযোগ, স্বদেশসেবা, পরোপকার ইত্যাদি তত্ত্ব জীবনের কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন ; আবার (খ) ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ইত্যাদি কার্য্যে পরিণত না-ও করিতে পারেন।

(২) উৎকৃষ্ট বিদ্বান্, পণ্ডিত, কবি ইত্যাদি হইয়া কোন ব্যক্তি (ক) ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ইত্যাদি জীবনের কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন ; (খ) আবার না-ও পারেন।

স্বদেশসেবা কাহাকে বলে, বৈরাগ্যের লক্ষণ কি কি—ইত্যাদি বিষয় এখানে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। এই সকল কার্য্য যাহাই হউক, পাণ্ডিত্য, কাব্যালোচনা, সাহিত্যসেবা ইত্যাদির সঙ্গে ইহাদের কোন প্রকৃতিগত সম্বন্ধ নাই।

সুতরাং কোন লোককে বিচার করিতে হইলে—বিশেষতঃ তাঁহার সাহিত্যসেবার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে—আমরা সাহিত্য-জগতের নিয়মের যেন বাহিরে না যাই। যদি সাহিত্য বুঝিবার জন্য লেখকের জীবনবৃত্তান্ত-ঘটিত কোন কথা বলা আবশ্যক হয়, তবে সর্ব্বদা যেন মনে থাকে যে, তাহা অবান্তর মাত্র। কোন্ মুহূর্ত্তে কবির কাব্য-সমালোচনা ত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছি, তাহা ভুলিয়া গেলে

কোন ব্যক্তি চরিত্রহিসাবে বড় বা ছোট তাহা জানি বলিয়া সাহিত্যসেবী হিসাবে সেই ব্যক্তিকে বড় বা ছোট যেন না বলিয়া ফেলি ! সাহিত্য-সমালোচনার ইহাই বৈজ্ঞানিক রীতি ।

কবিবরের উক্তি

এখন আমরা কবিবরের অভিভাষণ হইতে আমাদের আলোচিত অংশটুকু উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"যাঁরা জনসাধারণের নেতা, যাঁরা কর্ম্মবীর, সর্ব্বসাধারণের সম্মান তাঁদেরই প্রাপ্য এবং জন-পরিচালনার কাজে সেই সম্মানে তাঁদের প্রয়োজনও আছে। যাঁরা লক্ষ্মীকে উদ্ধার করবার জন্য বিধাতার মন্থন-দণ্ডস্বরূপ হয়ে মন্দর পর্ব্বতের মত জনসমুদ্র মন্থন করেন, জনতা-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে, তাঁদের ললাটকে সম্মান-ধারায় অভিষিক্ত করবে, এইটেই সত্য, এইটেই স্বাভাবিক।

কিন্তু কবির সে ভাগ্য নয়। মানুষের হৃদয়ক্ষেত্রেই কবির কাজ এবং সেই হৃদয়ের প্রীতিতেই তাঁর কবিত্বের সার্থকতা। কিন্তু এই হৃদয়ের নিয়ম বিচিত্র—সেখানে কোথাও মেঘ, কোথাও রৌদ্র। অতএব প্রীতির ফসলেই যখন কবির দাবী, তখন এ কথা তাঁর বলা চল্‌বে না যে, নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণেরই প্রীতি তিনি লাভ করবেন। যাঁরা যজ্ঞের হোমাগ্নি জ্বালাবেন, তাঁরা সমস্ত গাছটাকেই ইন্ধনরূপে গ্রহণ করতে পারেন, আর মালা-গাঁথার ভার যাঁদের উপরে, তাঁদের অধিকার কেবলমাত্র শাখার প্রান্ত ও পল্লবের অন্তরাল থেকে দুটি চারটি করে ফুল চয়ন করা।

কবি বিশেষের কাব্যে কেউ বা আনন্দ পান, কেউ বা উদাসীন থাকেন, কারো বা তাতে আঘাত লাগে এবং তাঁরা

আঘাত দেন। আমার কাব্যসম্বন্ধেও এই স্বাভাবিক নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হয়নি, এ কথা আমার এবং আপনাদের জানা আছে।”

কবিবর সাহিত্যসেবা এবং স্বদেশসেবার পার্থক্য কেবল সম্মান-লাভের দিক হইতে দেখাইয়াছেন। আমরা এই পার্থক্য ব্যাপক ভাবে দেখাইলাম। আমরা একটুকু গোড়ার কথা, ‘প্রেরণা’র কথা, দুইশ্রেণীর ব্যক্তির ভিতরকার অনুপ্রাণনার কথা বিশ্লেষণ করিয়াছি।

ভারতবাসীর নোবেল-প্রাইজ-লাভ

রবিবাবু তাঁহার সম্বর্দ্ধনার উত্তরে দেশবাসীকে জানাইয়াছেন :—

"দেশের লোকের হাত থেকে যে অপযশ ও অপমান আমার ভাগে পোঁচেছে, তার পরিমাণ নিতান্ত অল্প হয়নি এবং এতকাল আমি তা নিঃশব্দে বহন করে এসেছি। এমন সময় কি জন্য যে বিদেশ হতে আমি সম্মান লাভ করলুম, তা এখন পর্য্যন্ত আমি নিজেই ভাল করে উপলব্ধি করতে পারিনি। আমি সমুদ্রের পূর্ব্ব তীরে বসে যাঁকে পূজার অঞ্জলি দিয়েছিলেম, তিনিই সমুদ্রের পশ্চিম তীরে সেই অর্ঘ্য গ্রহণ করবার জন্য যে তাঁর দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করেছিলেন, সে কথা আমি জানতুম না। তাঁর সেই প্রসাদ আমি লাভ করেছি এই আমার সত্য লাভ।

যাই হোক্, যে কারণেই হোক্, আজ য়ুরোপ আমাকে সম্মানের বরমাল্য দান করেছেন। তার যদি কোনো মূল্য থাকে, তবে সে কেবল সেখানকার গুণিজনের রসবোধের মধ্যেই আছে। আমাদের দেশের সঙ্গে তার কোনো আন্তরিক সম্বন্ধ নেই। নোবেল-প্রাইজের দ্বারা কোনো রচনার গুণ বা রসবৃদ্ধি করতে পারে না।"

এই উত্তর সম্বর্দ্ধনা-উৎসবের উপযোগী হইয়াছিল কি না—আমরা জানি না। উদ্ধৃতাংশের অর্থ সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলিবে। আমরা তাঁহার ব্যক্তিগত "সম্মানলাভে"র, তাঁহার

"বরমাল্য" প্রাপ্তি সম্বন্ধে, অথবা তাঁহার "সত্যলাভ" বিষয়ে কোন সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহার নীরব ভক্তভাবে আমরাও তাঁহার সার্থকতা লাভে আনন্দিতই হইয়াছি। কিন্তু দেশের একজন ভাবে এই উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে দু'একটি মাত্র কথা বলিয়া রাখিতে চাহি।

প্রথমতঃ, ভারতের হিন্দু-মুসলমান, আমরা অবনত ঘৃণিত জাতি। পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছি বলিয়া কোন লোক স্বীকার করে না। এই কারণে আমাদের নৈতিক অধোগতির চূড়ান্ত হইয়াছে। দেশের লোকের গৌরবে গৌরব বোধ না করিয়া আমরা হিংসাই করিয়া থাকি। পরের উন্নতিতে আমাদের বুক চড় চড় করে—চোখ টাটায়! স্বদেশ ও স্বসমাজকে সম্মান করা ত দূরের কথা—নিজের উপরই বিশ্বাস বিন্দুমাত্র নাই। নিজেকেই নিজে চিনি না। আত্মশক্তিতে নির্ভর করি না—আত্ম-বিশ্বাস ও আত্মসম্মান কাহাকে বলে জানি না। তবে অন্ধকার কাটিতেছে—বিশ্বাস জন্মিতেছে—আত্মসম্মানবোধ জাগিতেছে। এই জন্য রামমোহন, ভূদেব, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, নবীন, হেমচন্দ্র, বিবেকানন্দ—সকলকে বিস্মৃতির গর্ভ হইতে টানিয়া আনিতে সচেষ্ট হইয়াছি। দশ বৎসর পূর্ব্বে লোকে স্বামী বিবেকানন্দকে "নরা দত্ত," "বিবেকানন্দ দত্ত" বলিত, এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসকেও লোকে "রামকৃষ্ণ বাবু" বলিত! তখন তাঁহারা জীবিত। আজ রবীন্দ্রনাথকে সজ্ঞানে দুইবার সম্বর্দ্ধনা করিবার মতি হইয়াছে, ইহাই আমাদের সৌভাগ্য।

এখন যে স্বদেশীয় একজন সুধীকে সম্মান করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছি ও নিজ জীবনকে ধন্য মনে করিতেছি—তাহা কতদিনের কথা? এ শিক্ষা কতদিনের? গভীরভাবে দেখিলে বুঝিতে পারিব—বিগত ৭।৮ বৎসরের মধ্যেই উন্নত-জাতিসুলভ বীরপূজার প্রবৃত্তি আমাদের চরিত্রে বিশেষভাবে দেখা দিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় জীবনের দুই যুগ দেখিলেন। তিনি আমাদের ইতিহাসের সন্ধিকালে উপস্থিত। এই জন্যই পূর্ব্বযুগের অবজ্ঞা—এবং নবযুগের বিকাশোন্মুখ, কথঞ্চিৎ আন্তরিক কথঞ্চিৎ কপট, খানিকটা লোকদেখান খানিকটা যথার্থ লোক-প্রীতি—এই দুই প্রকার ঘটনা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল। ইহা দুঃখের কথা নয়, পরিতাপের বিষয় নয়—আনন্দ-উৎসবের সময়ে তির্য্যগ্‌ভাব-প্রদর্শনের উপলক্ষ্য নয়।

বীর-পূজার এখন প্রারম্ভিক অবস্থামাত্র। সময় আসিতেছে যখন আমরা আধ-কপটতা আধ-আন্তরিকতা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ হৃদয়ে বীরের সম্বর্দ্ধনায় তন্ময় হইয়া পড়িব। তখন টাউন-হলের সভায় লোক হইবে কি না এই সন্দেহে পূর্ব্ব হইতে আয়োজন করিবার জন্য ব্যস্ত হইব না। তখন ছেলে জমা করিয়া সভার আসর পূর্ণ করিতে হইবে না। সেই সময়ে রাস্তায় ঘাটে, মাঠে বাটে, দোকানে বাজারে, কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে নৈসর্গিক আনন্দের ধ্বনি পড়িয়া যাইবে—কুলী-মজুর, ফেরীওয়ালা, দর্জ্জি, তাঁতী, কর্ম্মকার, মাষ্টার, কেরাণী একত্র হইয়া সেই বীরপুরুষের

বীণা-ঝঙ্কারে নাচিতে থাকিবে, গাহিতে থাকিবে। সমগ্র দেশব্যাপিনী ভাবুকতার বন্যা জনসমাজকে প্লাবিত করিবে। এইরূপ আনন্দে পাগল আমরা হইতে জানি না তাহা নহে। যে দিন ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে কবীর, তুকারাম, শ্রীচৈতন্যের ন্যায় পাগল আবির্ভূত হইয়া অভঙ্গ্ কীর্ত্তন গাহিতেছিলেন, সে দিন ভারতমাতার সন্তান-সন্ততি বিনা বিজ্ঞাপনে বিনা বক্তৃতায় পাগল হইতে শিখিয়াছিল—বীরপূজা করিতে পারিত—দেশের লোককে সম্মান করিতে জানিত। আর কি আমরা পাগল হইব না ?

বিদেশে পূজালাভ

দ্বিতীয় কথা—লোকে বলে, "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।" আমরা এই সঙ্গে যদি বলি "বিদেশে বিদ্বান্ পূজ্যতে আগে, স্বদেশে পরে পূজ্যতে" তাহা হইলেও বোধ হয় মিথ্যা বলা হইবে না। ফরাসী পণ্ডিতের সম্মান ইংরাজ আগে করিয়া থাকে। ইংরাজ পণ্ডিতের সম্বর্দ্ধনা জার্ম্মাণী আগে করিয়া থাকে। আমেরিকার গুণীর আদর ফরাসী জাতি আগে করে। বিদ্যা-জগতের, সাহিত্য-জগতের, শিক্ষা-জগতের দস্তুরই প্রায় এইরূপ।

দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতে হইবে কি? প্রসিদ্ধ জার্ম্মান্ দার্শনিক লাইব্‌নিজ্ (১৬৪৬—১৭১৬ খৃঃ অঃ) জার্ম্মাণিতে কিছুমাত্র উৎসাহ পান নাই। জার্ম্মাণির প্রসিদ্ধ নৌতত্ত্ববিৎ ও গণিতজ্ঞ পণ্ডিত মেয়ার (Tobias Mayer) ইংরাজ-জাতির অর্থ সাহায্যে তাঁহার মৌলিক অনুসন্ধান ও গবেষণাসমূহ প্রকাশ করিতে সমর্থ হন। প্রসিদ্ধ জার্ম্মান্ বৈজ্ঞানিক হাম্বল্ড (১৭৬৯-১৮৫৯) নিজ অর্থবলে এবং ফরাসী-সাহিত্য-পরিষদের অনুগ্রহে রচনাবলী প্রকাশ করিতেন। জার্ম্মাণির সাহিত্য-জগতে সম্বর্দ্ধনা তিনি মৃত্যুর অত্যল্পকাল পূর্ব্বেই লাভ করেন! প্রকৃত প্রস্তাবে ফরাসী-সাহিত্য-পরিষদের অর্থ-সাহায্য এবং সম্বর্দ্ধনা লাভ করিবার-পর জার্ম্মাণির জগৎ-প্রসিদ্ধ

বৈজ্ঞানিকগণ জার্ম্মাণিতে এবং অন্যত্র প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন কি, ইংরাজ-সন্তান নিউটনও বিলাতেই প্রথমে "কল্কে পান" নাই। লাইবনিজ যেমন স্বদেশে এবং স্বসমাজে বহুকাল অনাদৃত ছিলেন—নিউটনের আবিষ্কারও সেইরূপ বিলাতী সাহিত্যে এবং ইংরাজী চিন্তায় বহুকাল পর্য্যন্ত কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ফরাসী সাহিত্যসেবী ভল্টেয়ারের পৃষ্ঠপোষকতায়ই নিউটন-তত্ত্ব জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

নিউটন এবং লাইবনিজ্‌কে বাদ দিয়াই সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজ ও জার্ম্মান্ লেখকগণ তাঁহাদের স্বদেশীয় বিদ্বান্‌দিগের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিতেন। অথচ এই দুইজনকে বাদ দিলে আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়া কাটিয়া ফেলা হয়!

বিলাতের রয়েল সোসাইটি এবং অন্যান্য বিজ্ঞান-পরিষৎ ও সাহিত্য-সমিতির গত দুই শত বৎসরের কাগজপত্র দেখিলে বুঝা যায়—ইংরাজ-সমাজে স্বার্থপরতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সঙ্কীর্ণচিত্ততা, হিংসাদ্বেষ, দলাদলি ইত্যাদি কত বেশী ছিল এবং এখনও কত আছে। ফরাসী-পরিষৎও স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের কত গবেষণা চাপিয়া রাখিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। জার্ম্মান্ পণ্ডিতগণেরও অনেক সময়ে উৎসাহাভাবে প্রতিভা নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

ইংরাজ-সমাজে এ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দোষই দেখা গিয়াছে। বিলাতী রসায়নের প্রধান স্তম্ভ পণ্ডিত ড্যাল্টনের (১৭৬৬-১৮৪৪) দুর্গতি কাহার না মনে আছে? ফ্যারাডেও

অর্থাভাবে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইংরাজ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিকগণ যে সকল কথা দেশের লোককে শুনাইয়াছেন তদনুসারে তাঁহারা স্বদেশে কার্য্যতঃ অথবা মুখতঃ কোন সমাদর লাভ করেন নাই। জার্ম্মাণির বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং ফরাসী-সাহিত্য-পরিষৎ প্রভৃতি বিদেশীয় "রসবোধজ্ঞ গুণিজন" না থাকিলে বিদ্যার জগতে বিলাতের নাম থাকিতই কি না সন্দেহ! অতএব দেখা গেল—কেবল বাঙ্গালী বা ভারতবাসীই দেশীয় পণ্ডিতকে অবজ্ঞা করে তাহা নহে। জার্ম্মাণি, ফরাসী, ইংরাজ সকলেই এ সম্বন্ধে পাপী।

পাশ্চাত্য সভ্যতার মারপ্যাঁচ

তৃতীয়তঃ, সত্যসত্যই কি পাশ্চাত্য জগতের "গুণিজনে"রা অতি উচ্চ অঙ্গের রসজ্ঞ—বড় পাকা সমজদার ? তাঁহারা কি নিক্তির ওজনে মাপিয়া রুশ, ফরাসী, জার্ম্মান্, আমেরিকান, প্রাচ্য, সকল প্রকার লোকের বৈজ্ঞানিক গবেষণা, সাহিত্যসেবা, পরোপকার, লোকহিত, কাব্যালোচনা ইত্যাদির মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন ? তাঁহারা কি দেশকালপাত্র বিবেচনা না করিয়া সকল স্থলেই পক্ষপাতশূন্য যথার্থ সমালোচনা করিয়া থাকেন ? তাঁহারা কি হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মভেদ ও সাদা, কাল, লাল, পীত, রংএর চামড়াভেদ, এবং ফরাসী, জার্ম্মান্, গ্রীক, ইংরাজ, রুশীয়, ভারতীয়, চীনা, জাপানী ইত্যাদি 'জাতিভেদ' না করিয়াই বিদ্যা বুদ্ধির সম্মান করেন ? আমরা পাশ্চাত্য চিন্তা-জগতের কিছু কিছু সংবাদ রাখিয়া থাকি। আমরা পাশ্চাত্য রাষ্ট্র-মণ্ডলের রেষারেষি, দলাদলির ইতিবৃত্ত এবং বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ নহি। ফরাসী জাতির কোন এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে রুশজাতির কোন এক সম্প্রদায়ের কিরূপ সম্বন্ধ, জার্ম্মাণির কোন পণ্ডিত-সমাজের সঙ্গে আমেরিকা বা ইংলণ্ডের কোন বিদ্বৎ-পরিষদের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা বুঝিবার উপায় আছে।

যদি পাশ্চাত্য জগৎসম্বন্ধে কোন কথা জোরের সহিত বলা যাইতে পারে, তবে তাহা এই—

পাশ্চাত্য জগতে কোন বিষয়ে নিরপেক্ষ সমালোচনা বিন্দুমাত্র নাই। তাঁহারা মতলব অনুসারে কাজ করেন, কথা বলেন, বক্তৃতা দেন, পরামর্শ দেন, সন্ধি করেন, পুস্তক প্রকাশ করেন! প্রতিপদবিক্ষেপে, প্রতিদিনকার ওঠাবসায়, ঘরোয়া-বৈঠকে, চা-পানের নিমন্ত্রণে, এবং মন-রাখা আনাগোনায় তাঁহাদের ফিকিরী, চালাকী, ওস্তাদী, সোজা কথায় ডিপ্লমেসী পরিস্ফুট। তাঁহাদের সমাজ, তাঁহাদের ধর্ম্ম, তাঁহাদের রাষ্ট্র, তাঁহাদের সাহিত্য, তাঁহাদের বিবাহ, তাঁহাদের লোকসেবা—প্রত্যেক ক্ষুদ্রবৃহৎ কার্য্য-কলাপেই এই "পাঁচ চালে মাত" করিবার পন্থা, ভবিষ্যতে "কাজ হাঁসিল" করিবার কৌশল দেখিতে পাইবে। কাজেই তাঁহাদের জগতে যতগুলি বিদ্যার কেন্দ্র, যতগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠান, যতগুলি বিজ্ঞান-পরিষৎ, যতগুলি মানব-সেবক-সমিতি, যতগুলি রাষ্ট্রীয় "দল," যতগুলি পার্ল্যামেণ্ট-ক্যাবিনেট, যতগুলি সংবাদপত্র বা মাসিকপত্র, যতগুলি ধর্ম্মসভা রহিয়াছে, সেই সমুদয়ের নিত্য-নৈমিত্তিক "চাল"-পরিবর্ত্তন অনেক "ভিতরকার কথা"র উপর নির্ভর করে। সেই ভিতরকার কথাগুলি আর কিছুই নয়—দলাদলি, অনৈক্য, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অন্যকে "বাগে ফেলিবার" চেষ্টা, দশ জনকে 'কাবু' করিবার অভিসন্ধি, হিংসা-দ্বেষ-কলহ ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহাদের সাহিত্যবিষয়ে "রসবোধও" এইরূপ অসংখ্য দলাদলির মতলববাজীর এবং আড়াআড়ির কোন কোন ঘটনা

পুঞ্জের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যজগৎ সামান্য-সামান্য কার্য্যকলাপেও সরল, সহজ, পক্ষপাতশূন্য, সমদর্শী, আন্তরিকতাময়, অর্থাৎ হৃদয়ের সহিত বিশ্বাসযোগ্য নয়।

আমাদের অনেকে তোতাপাখীর মত শিখিয়াছেন, এবং বুলি আওড়াইয়া থাকেন যে, পাশ্চাত্যজগৎ বড়ই ঐক্যবিশিষ্ট, ঐক্যই তাহাদের শক্তির প্রধান কারণ, তাহাদের একতার গুণেই তাহারা আজ জগতে প্রসিদ্ধ। ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমান, তোমরা বহুকাল হইতে অনেক মিথ্যা কথা শিখিয়াছ। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, পাশ্চাত্য জগতের একতা সম্বন্ধে তোমাদের যে ধারণা তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বড় মিথ্যা। তোমরা ইতিহাস পড়িয়াছ—তোমরা পণ্ডিত। কিন্তু বলিতে পার প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় জীবনের কোন্ অধ্যায়ে ঐক্যশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়? এই তথাকথিত একতা ইতালীর ইতিহাসে কোন যুগে ছিল কি? ইউরোপীয় মধ্যযুগের বৃত্তান্ত নিশ্চয়ই তোমাদের জানা আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের চতুর্দ্দশ লুই ঘুস দিয়া অন্যান্য দেশের রাজাগুলিকে 'হাত করিতেন' এবং নানা উপায়ে প্রত্যেক সমাজকে নানা স্ব-স্বপ্রধান দলে বিভক্ত করিয়া ফেলিতেন। তাহা ত বিদ্যালয়ের ছোটখাট ইতিহাস-পুস্তকেই বালকেরাও জানে!

তারপর আধুনিক যুগের কথা কি আর চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে হইবে? ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাহার বহুপূর্ব্বে আমাদের অনেকের জন্ম হইয়াছে, সেই সময় পর্য্যন্ত "ইতালি" নামে কোন রাষ্ট্র ছিল না, জার্ম্মাণি নামেও একটা দেশ পৃথিবীর

লোকের চিন্তার মধ্যে স্থান পাইত না। শত-শত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গ্রাম-জনপদ-জেলায় এই সকল দেশ খণ্ডীকৃত ছিল। আমেরিকার যুক্ত-প্রদেশ-গঠন ত কালকার কথা। পাশ্চাত্যজগতে ঐক্য কোথায় বলিতে পার কি ?

জার্ম্মাণিতে এবং আমেরিকাতে যুক্তরাজ্য ত গঠিত হইয়াছে। এই "যুক্ত"-রাজ্যগুলির মধ্যে কত অসংখ্য অনৈক্য, স্বার্থ-তৎপরতা, গ্রামে গ্রামে 'হাম বড়া' ভাব, পরস্পর প্রতিযোগিতা, এবং বিচারালয়ে, মন্ত্রণা-সভায়, ও ধর্ম্ম-কর্ম্মে বিভিন্নতা রহিয়াছে, তাহার তালিকা করিতে গেলে হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী একখানা সুবৃহৎ গ্রন্থ লেখা হইয়া যাইবে। কেবল ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমানই কি অনৈক্যের জন্য, দলাদলির জন্য, মতভেদের জন্য পাপী ?

তবে কি পাশ্চাত্যজগতে ধর্ম্মবিষয়ে ঐক্য আছে ? সত্য কথা, আমরা যাহাকে ধর্ম্ম বলি, পাশ্চাত্য জগতে সেই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব একেবারেই নাই। তোমরা বোধ হয় মনে কর সমগ্র খৃষ্টান-জাতি মুসলমান-জাতি বা ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এবং বৌদ্ধজাতি বা ধর্ম্মের বিরুদ্ধে একমত ! মিথ্যা কথা। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমান-জাতি তুরস্ক অধিকার করিয়া ইউরোপে বসতি আরম্ভ করেন। তখন হইতে ভিন্ন ভিন্ন খৃষ্টানজাতি ভিন্ন-ভিন্ন মতলবে তুরস্কের সুলতানের সঙ্গে ভিন্ন-ভিন্ন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। খৃষ্টান ইউরোপের ভিতর কিছুমাত্র ঐক্য ছিল না বলিয়াই

অনৈক্যই মুসলমান জাতির শক্তি। সেইরূপ জাপানের অভ্যুদয়-ব্যাপারটা লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে তাহারও একটা কারণ বা সুযোগ সেই খৃষ্টানের অনৈক্য। তারপর এই যে চোখের সম্মুখে গ্রীস-বল্কান-মরক্কো-চীনদেশসমূহে কাণ্ড চলিতেছে সেখানে পাশ্চাত্য সমাজের ঐক্য দেখিলে না অনৈক্য দেখিলে?—শক্তি দেখিতেছ না দুর্ব্বলতা দেখিতেছ?—দলবাঁধা দেখিতেছ, না দলাদলি দেখিতেছ?

যাহা হউক, "ধান্ ভান্‌তে শিবের গীত" আমরা অনেকখানি গাহিয়া ফেলিলাম। প্রকৃত কথা এই—পাশ্চাত্যজাতি ভবিষ্যৎ জাতীয়-স্বার্থ, রাষ্ট্রীয় ডিপ্লমেসি, পরস্পর-প্রতিযোগিতা, এবং প্রাচ্য-প্রতীচ্য-ভেদ বিবেচনা না করিয়া কোন দিন কোন বিষয়ে কার্য্য করেন নাই। আমাদের বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বোধ হয় এ সম্বন্ধে খুব ভাল সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। এই সঙ্গে অবান্তর ভাবে একটা কথা বলিয়া রাখি—জগদীশচন্দ্র ভারতে বসিয়া যে সকল স্বাধীন গবেষণা করিতেছেন আমরা দেখিয়াছি সেই সকল গবেষণার ঐতিহাসিক বিবরণে জগদীশচন্দ্রের উল্লেখ অল্পই হইয়া থাকে। অথচ পাশ্চাত্যজগতের পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা ঐ সকল বিষয়ে পরীক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের কার্য্যাবলী বিশেষ-রূপেই বিবৃত হয়। জগদীশচন্দ্র পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-জগতে নূতন-নূতন উপাধি পাইবার উপযুক্ত কি না, তাঁহার আবিষ্কার অথবা গবেষণাগুলির মূল্য আছে কি না তাহার বিচারক আমরা নহি। কিন্তু যাঁহারা "রসবোধজ্ঞ গুণিজন" তাঁহারা রামচন্দ্রের সেতুবন্ধে

কাঠবিড়ালীর প্রয়াসও যথাযথ বিবৃত করিবেন—ইহাই আমরা আশা করিতে পারি। জগদীশচন্দ্র একেবারেই উপেক্ষিত হইতেছেন বা হইয়াছেন তাহাও আমরা বলিতে চাহি না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-জগতের মহলে মহলে তাঁহার নামোল্লেখ প্রশংসার সহিতই হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার ভিতরে যে কত রহস্য আছে, তাহা অবশ্য স্বয়ং জগদীশচন্দ্র জানেন, এবং যাঁহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিত-জগতের কারচুপী বুঝেন, তাঁহারা কিছু কিছু অনুমান করিতে পারিবেন। ও দেশে একজনের রচনা বা আবিষ্কার বা অনুসন্ধান আর একজনের নামে প্রচারিত হয় কি না, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কে বলিতে পারে ?

স্বদেশের স্বর্ণ-সিংহাসন

চতুর্থতঃ, ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমান, তোমরা রবীন্দ্রনাথকে এতদিন কি কেবল নিন্দাই করিয়া আসিয়াছ? রবীন্দ্রনাথের "দেশের লোকের হাত থেকে" "অপমান ও অপযশ" মাত্রই কি তাঁর "ভাগ্যে পৌঁছেছে?" তিনি "সমুদ্রের পূর্ব্বতীরে বসে যাঁকে পূজার অঞ্জলি দিয়েছিলেন" সেই বাল্মীকি-কালিদাস-জয়দেব-রামপ্রসাদ-বঙ্কিম-দ্বিজেন্দ্রলালের আরাধ্যদেবতা, "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা—জয়দা বরদা," "বন্দে মাতরং"-ধ্যানের বিগ্রহ-মূর্ত্তি ভারতমাতা স্বীয় সন্তানের অঞ্জলি গ্রহণ করিবার জন্য সমুদ্র সন্তরণ পূর্ব্বক পরপারে যাইয়া "দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করেছিলেন"—ইহা কি সত্য? বাঙ্গালী তাহা স্বীকার করিবে না—ভারতবাসী তাহা স্বীকার করিবে না। পাশ্চাত্য জগৎ রবীন্দ্রনাথকে যে ভাবে সমাদর করিতেছেন, তাহাতেও বুঝা যায় তাঁহারা কবিবরের এ কথা আদৌ স্বীকার করেন না যে, "আমাদের দেশের সঙ্গে তার কোনো আন্তরিক সম্বন্ধ নেই।"

ভারতবর্ষের সনাতনী বাণী এবং হিন্দুর হিন্দুত্বটুকু বাদ দিলে পাশ্চাত্যজগৎ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নূতন কিছুই পাইবেন না—এ কথা তাঁহারা বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য-জগতে ভারতীয় জীবন-গঙ্গার অন্যতম ভগীরথরূপেই রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের পূজা পাইতেছেন। ভগীরথের মাহাত্ম্য আছে স্বীকার করি—রামা-শ্যামা ভগীরথ

সাজিলে পতিতপাবনী গঙ্গার মর্ত্ত্যে আগমন হয় না, তাহা নিতান্ত অজ্ঞ লোকেরাও বলিবেন। কিন্তু গঙ্গা-মাহাত্ম্য যদি ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে গোড়ার কথাই বাদ পড়িল। ভগীরথকে লইয়া নাচানাচি করিবার কোন উপলক্ষ্যই থাকিবে না!

পাশ্চাত্যজগৎ বুঝিয়াছে—রবীন্দ্রনাথ ভারতাত্মাকে ইউরোপে পৌঁছাইয়াছেন। ইউরোপের যে জিনিষের অভাব ছিল—বহুদিন হইতে যে অভাব নানা কারণে ইউরোপ বুঝিয়াও বুঝে নাই—সম্প্রতি যে অভাব অন্যান্য বহু কারণে (সাহিত্য, কাব্য ছাড়াও অসংখ্য কারণে) তাঁহাদিগকে পদে পদে বেদনা দিতেছে—সেই অভাব-মোচনের উপায়-স্বরূপ ভারতের সনাতনী ভাবুকতা লইয়া রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য ভাব-গগনে উদিত হইয়াছিলেন। প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ এই পথ দেখাইয়াছিলেন। আজ "বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগতময়—বাঙ্গালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।" কবিবরকে সম্বর্দ্ধনা করিতে যাইয়াও খৃষ্টানেরা হিন্দুর নিকট সেই শিষ্যত্বেরই একটা নূতন পরিচয় দিয়াছেন।

বোলপুরের সম্বর্দ্ধনায় দুইজন খৃষ্টান হিন্দুর নিকট পাশ্চাত্যের শিষ্যত্ব-গ্রহণের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। "সঞ্জীবনী" হইতে আমরা তাঁহাদের সম্ভাষণ উদ্ধৃত করিতেছি। মিঃ মিলবারণ বলিয়াছিলেন—

"আপনার কবিতা পাঠ করিয়া আমরা এই বিশাল বিশ্ব-ব্যাপার এক নূতন ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি, যাহা আমরা আর পূর্ব্বে

কখনও করিতে পারি নাই। আমি একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছি। আমি আনন্দের সহিত উল্লেখ করিতেছি যে, আপনার 'গীতাঞ্জলি'র অনেকগুলি স্তোত্র সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক নিত্য প্রভাতে গীত হইয়া থাকে। আপনার 'গীতাঞ্জলি' আমাদের শাস্ত্রোক্ত উপাসনা-মন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে।"

মিঃ হল্যাণ্ড বলেন—

"মহাশয়, আমাদের দেশের একজন কবি বলিয়াছিলেন 'যিনি দয়া প্রদর্শন করেন এবং যাঁহার প্রতি দয়া প্রদর্শিত হয়, তাঁহারা উভয়েই আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।' সম্মান সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ কথা বলা যায়। বাস্তবিক, জগতের কবিসভায় আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে পুরস্কৃত করিয়া, ইউরোপ সমগ্র সভ্য-সমাজে গৌরবান্বিত হইয়াছে। আজ আপনার সম্মানে যদি কাহারও অধিক আনন্দের কারণ থাকে, তবে সে ইউরোপের; আমি আজ আপনার সম্মুখে সেই আনন্দ প্রকাশ করিতে আসিয়াছি। বহুকাল পর্য্যন্ত প্রতীচ্যপ্রদেশ ভারতবর্ষকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, আজ আপনার এই পুরস্কার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই বলিতেন যে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে মিলন অসম্ভব, কিন্তু আপনাকে এই বৎসর যে পুরস্কার প্রদত্ত হইল, তাহার ফলে পণ্ডিতগণের এই উক্তি খণ্ডিত হইয়া গেল, পূর্ব্ব-পশ্চিমে মিলন হইল—আর এ মিলন কোন সম্প্রদায়বিশেষের

নহে—যেখানে নিত্য জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মার প্রকাশ, এ মিলন সেই অধ্যাত্মরাজ্যে !"

কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ হিন্দুর বাণী প্রচার করিয়া পাশ্চাত্যকে ত মুগ্ধ করিলেন ; কিন্তু এতদিন পাশ্চাত্য জগৎ ভারতবর্ষকে সম্মান করে নাই কেন ? প্রাচ্যের কাল চামড়ার ভিতর যে এত মূল্যবান্ হৃদয় লুক্কায়িত থাকিতে পারে তাহা জার্ম্মাণ পণ্ডিত শোপেনহোয়র এবং ম্যাক্স্‌মুলার বহুদিন পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্ম্মতত্ত্ব যে কত দুর গভীর ও উদার তাহাও ম্যাক্স্‌মুলার প্রচার করিয়াছিলেন। আমেরিকার প্রসিদ্ধ রাষ্ট্র-নীতিবিশারদ পণ্ডিত রাইন্‌স্ (Dr. Paul S. Reinsch) মহোদয় প্রাচ্য-জগতের জীবন-স্পন্দন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে যাইয়া চীন, জাপান ও ভারতবর্ষের চিন্তাবীরগণের মধ্যে বিবেকানন্দকে অত্যুচ্চ আসনই প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এতদিন পরে একটা নোবেল-প্রাইজ-লাভ ভারতবাসীর কপালে কেন ঘটিল ? আইরিশ কবি ইয়েট্‌সের বিদ্যা বুদ্ধি ভাবুকতা রসজ্ঞতা কি শোপেনহোয়ারাদি পণ্ডিতগণ অপেক্ষা বড় বেশী ? ইঁহার স্থান পাশ্চাত্য জগতে এই সকল গুণিজন অপেক্ষা নিম্নে হইতে পারে—এখনও সমান নহে—কোন দিন সমান হইবে কি না অতটা ভবিষ্যদ্বাণী করিবার যোগ্যতা লাভ করিবার জন্য ইয়েট্‌সের কাব্য আলোচনা করি নাই।

ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান, ইহার মধ্যে কি কোন রহস্যই

নাই? আমরা গত সংখ্যায় বলিয়াছিলাম,—"কতকগুলি ঘটনা-চক্রের প্রভাবে, হিন্দু চিন্তাবীরকে—একটি ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষার আজীবন সেবককে—প্রাচ্যজগতের তথাকথিত 'অর্দ্ধ-সভ্য' জাতি-প্রসূত মানব-সন্তানকে পাশ্চাত্য জগৎ বৈঠকে বসিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সম্মান ও পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কি কি কারণে ইউরোপীয় সুধীবর্গ প্রাচ্যজগতের একজন সাহিত্যবীরকে এরূপ সম্বর্দ্ধনা করিয়া সম্মান ও গৌরব বোধ করিলেন, তাহার আলোচনা করিবার জন্য অনতিদূর ভবিষ্যতেই দার্শনিক ও ঐতিহাসিকগণ আগ্রহ সহকারে অগ্রসর হইবেন। অধিকন্তু, ইতিহাস-বিজ্ঞানের কোন্ নিয়মানুসারে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সম্পদই মানব-জাতিকে ভারতীয় সাহিত্য ও জীবনধারার অন্যান্য বিভাগ বুঝাইবার উপায় ও কেন্দ্র-স্বরূপ হইল, তাহার বিশ্লেষণও অল্পকালের ভিতরই দেশবিদেশের পণ্ডিত-সমাজে আরব্ধ হইবে।"

দেখিতেছি—এই কারণগুলির অনুসন্ধান পাশ্চাত্যজগতে এখনই আরব্ধ হইয়াছে। "ঘটনাচক্র"গুলির বিশ্লেষণ কোন কোন ইংরাজ-সমালোচক ইতিমধ্যেই সুরু করিয়াছেন। দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা না করিয়া, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান না বুঝিয়া, স্বদেশের জাতীয় এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থাস্বার্থ বিচার না করিয়া পাশ্চাত্য জগতে কোন কাজ ও চিন্তা হয় না—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পাশ্চাত্যের রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা এবং রবীন্দ্রনাথের দিগ্বি-

সাময়িক কারণপুঞ্জের প্রভাবে এবং দেশ-কাল-পাত্র-বিবেচনার ফলে—পাশ্চাত্য সমাজের গুণিজনেরা স্বকীয় ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান স্বার্থ বিচার করিয়াই প্রাচ্য মানবের নিকট মাথা নত করিয়াছেন।

প্রাচ্যজগৎকে সম্মান না করিয়া পাশ্চাত্যের আর স্থির থাকিবার উপায় নাই—তাঁহারা ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছেন। তাঁহাদের পক্ষে প্রাচ্যের শক্তিকে অবজ্ঞা করা এখন বাতুলতা মাত্র। পাশ্চাত্য সমালোচকগণ সে কথা আর গোপন করিতেছেন না। এক ব্যক্তি বিশেষ ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে,—ভারত-মাহাত্ম্যে, জাতি-মাহাত্ম্যে এবং কাল-মাহাত্ম্যে ("Novelty of his nationality" এবং "time") হিন্দু কবি-বরের সম্মান হইল। আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"A few years ago his name was hardly known even to that small band of watchers for new lights upon the literary horizon. Then came the talk about the Delhi Durbar, and the Durbar itself; and all that vague interest in Eastern art, Eastern thought and Eastern literature, which had been steadily, if quietly, growing since the opening up of Japan, concentrated upon India. Hence the success of Kismet, of pseudo-Oriental dances, of the Russian ballet and 'Sumurun.' The plain man had pictures of India flashed upon him nightly from the bioscope; the businessman was forced to think about the startling change of capitals and speculate upon its consequences in commerce; while people who had been content to take their ideas about this country from

Kipling and other English writers began to ask for "inside information," and to seek in native literature itself for the secret of India's mysterious power to stir the imagination of Englishmen.

Tagore was fortunate in the time of his introduction to London. He found a public prepared to listen in a mood of curiosity and goodwill, a public, too, somewhat impatient just now of the older forms of endeavour in art, and sufficiently keen to recognise ability. A larger proportion of our people than ever before has found its way to material satisfaction, and now has leisure for less substantial pleasure, which in a previous generation were crowded out of its life. London, the ancient city of the Philistines, as the artists of that generation regarded it, has now in fact become what Paris was to them, a place where any one with any pretensions whatever to "a new note" in literature and art may get a hearing and secure a coterie."

আর একজন সমালোচক বলিয়াছেন—

"And it is significant that the envoy should have come when he did ; when the long misunderstanding of the East by the West that threatened to bring about further disaster should seem to be giving way. If ever an intermediary, gifted with a tongue of delicate eloquence, and with a real insight into the natures and temperamental ways of two peoples, was designed by fate for the office, it was surely Rabindranath Tagore. To be able to talk with him during his last visit was to gain a new intelligence of the spirit of India."

বুঝিলে—বর্ত্তমান ভারতকে পাশ্চাত্য জগৎ কি চোখে দেখিতেছে? এখন যে ভারতের দাঁড়কাক পর্য্যন্ত তাহাদের আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে!

উদ্ধৃতাংশের বঙ্গানুবাদ দিবার আর প্রয়োজন নাই। ভারতের হিন্দু-মুসলমান, এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা ভবিষ্যতে আমরা বলিব। কেননা ইহা বিংশশতাব্দীর নবযুগের কথা—কেবল তোমার আমার, হিন্দু-মুসলমানের, ভারত-চীন-জাপান-পারস্যের নবযুগ নয়। আজকাল জগতে যে সকল আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য—এসিয়া-ইউরোপ-আফ্রিকা-আমেরিকা—সমগ্র ভূখণ্ডেরই যুগান্তর-সাধনের পন্থা পরিষ্কৃত হইতেছে। সুতরাং ভারতের কালমাহাত্ম্য, যুগমাহাত্ম্য, জাতি-মাহাত্ম্য, সমাজ-মাহাত্ম্য আমাদিগকে সবিশেষ আলোচনা ত করিতে হইবেই। বিদেশীয় পণ্ডিতেরাও আর দরজা বন্ধ করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উদাসীন ভাবে বসিয়া থাকিতে পারিবেন না।

এখন কেবল এইটুকু জানিয়া রাখ যে, তোমরা জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথকে কেবলমাত্র অবজ্ঞাই করিয়াছ এ কথা স্বীকার করা যায় না। তাঁহার এবং অন্যান্য ভারতবীরের সম্বর্দ্ধনা করিতে তোমরা কিছুকাল হইল শিখিয়াছ। ভারতের বীণাপাণি স্বদেশেই তাঁহার অঞ্জলি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে—দেশবিদেশে যাহাতে ভারতবাসী মাত্রেই মাথা তুলিয়া সম্মানলাভ করিতে পারে, ভারতবর্ষের গুণিগণ আদৃত হইতে পারেন, ভারতের কাঠবিড়ালী পর্য্যন্ত তাহার যথোচিত মর্য্যাদা পাইতে পারে,

স্বদেশে তাহার পূর্ব্ব-ব্যবস্থা করিতে ভারতের সাধারণ জনগণ অভ্যস্ত হইতেছে। ভারতমাতা স্বয়ই এখন নিজ সেবকগণকে 'সার্টিফিকেট' দিতেছেন; এবং বিশ্বের বাজারে এই সার্টিফিকেটের, এই শীলমোহরের মূল্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের নাম ও প্রভাবকে জগৎ এখন আর তুচ্ছ করে না।

আমাদের এই আত্মসম্মান-বোধ-জাগরণের ফলে, এই জাতীয়-গৌরব-অনুভূতির উদ্বোধনে, এই নব-বিকশিত বীরপূজার বাসনা ও গুণিসমাদর-প্রবৃত্তির প্রভাবে স্বদেশে উচ্চ স্বর্ণ-সিংহাসন নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাতে উপবিষ্ট হইয়াই কেবল রবীন্দ্রনাথ কেন,—ক্ষুদ্র-বৃহৎ নগণ্য-সুগণ্য সকল ভারতবাসীই নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে দেশবিদেশে আদর, সম্মান, সহানুভূতি ও পূজা আকৃষ্ট করিতেছেন। দেশের লোকের মহত্ত্বেই, দেশীয় জন-সাধারণের গৌরব-বৃদ্ধিতেই, দূর-বিদেশের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ও চিন্তারাজ্যে ভারতবর্ষের কীর্ত্তি প্রচারিত হইবার ফলেই, দেশ-মাতার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াই, এবং ভারতীয় বীণাপাণির সস্নেহ অর্ঘ্যস্বীকার ও অঞ্জলিগ্রহণের প্রভাবেই রবীন্দ্রনাথ বিদেশে "সম্মানের বরমাল্য" লাভ করিয়াছেন—এ কথা তিনি ভুলিয়া থাকিতে চাহেন থাকুন, আমরা তাঁহার ভক্তভাবে কিছুকাল ভুলিয়া থাকিতে চাহি থাকি, কিন্তু "দেশের লোক" তাহা ভুলিবে না,—আর যাঁহারা তাঁহাকে বিদেশে পূজা করিতেছেন তাঁহারাও ইহা ভুলেন নাই, ভুলিতে পারেন না, ভুলিতে পারিবেন না।

আমরা এত কথা বলিয়া ফেলিলাম—ব্যাপারটা তলাইয়া

মজাইয়া আমাদের বুঝা আবশ্যক এই জন্য। রবীন্দ্রনাথকে আমরা এতকাল যে ভাবে আদর করিয়া আসিয়াছি—নোবেল-প্রাইজ লাভের দ্বারা তাহার বিন্দুমাত্র বাড়ে নাই; আমাদের রবীন্দ্র-সমাদর কোন দিনই কম ছিল না—কমিবেও না।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বৈষ্ণবের ভক্তিযোগ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—যে-সে ভগীরথ "ত্রিভুবনতারিণী বিমল-তরঙ্গা," "দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গা"র আবাহন গাহিতে পারেন না। ব্রহ্মশাপে ধ্বংসপ্রাপ্ত সগরের বংশ উদ্ধার করিতে হইলে যে-সে সাধনায় ব্রতী হইলে চলিবে না। রবীন্দ্রনাথ ভারতের বীণাপাণিকে তুচ্ছ সরঞ্জামে পূজা করেন নাই। ইউরোপের মোহান্ধ মানবজাতিকে ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্য জগদ্-গুরু ভারতবাসীর যে ষোড়শোপচারে বাগ্‌দেবীকে আরাধনা করা আবশ্যক, বঙ্গের রবীন্দ্রনাথ নানা ছন্দে নানা কণ্ঠে তাহা করিয়াছেন।

দেশভক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসেবার মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন :—"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম, ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।" রবীন্দ্রনাথও ভারতের সনাতনী বাগ্‌দেবতাকে সেই ভক্তি-মন্ত্রেই আজীবন পূজা করিয়াছেন। ভারতবাসীর কণ্ঠে কণ্ঠে আজ সেই মন্ত্র বিরাজ করিতেছে—

"তোমারি রাগিণী জীবন-কুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো।
তোমারি আসন হৃদয়-পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো॥"

আর একজন হিন্দু কবির মাতৃভক্তিও দেখ—বাণী-সাধক,

"আমি মা তোর পোষা পাখী, যা শিখাস্ মা তাই শিখি,
শিখায়েছিস 'তারা' বুলি, তাই ডাকি মা তারা তারা।"

—মাতৃভক্ত ভারতসন্তান, তুমি রবীন্দ্রনাথের নিকট ভক্তি-সাধনার যে মন্ত্র পাইয়াছ তাহা অপেক্ষা বেশী কিছু এই যুগেই চাহ কি ?—

"তব গৌরবে সকল গর্ব্ব
লাজে যেন সদা লাজে গো।
তব পদরেণু মাখি লয়ে তনু
সাজে যেন সদা সাজে গো॥"

—সকলপ্রকার ভক্তি শিক্ষার জন্য, ধর্ম্মক্ষেত্রে ও কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই নিজ জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবার জন্য, এবং "স্বদেশের ধূলি"কে "স্বর্ণরেণু" মনে করিবার জন্য আর কোন উপদেশের আবশ্যকতা আছে কি ? কৃষ্ণভক্ত প্রহ্লাদও মাটি ছুঁইয়া বলিতেন—"এ ত ধূলা নয়, হরির পদরজ।" সকল ভক্তি-তত্ত্বই এক।

শ্রীচৈতন্যময় বঙ্গদেশে,—ভক্তিপ্লাবিত ভারতবর্ষে—তুকারাম-কবীর-নানক-জয়দেবের আবির্ভাব-পূত হিন্দুস্থানে আধুনিক বাঙ্গালী কবির ভক্তিপ্রবণতা দেখিলে। আমাদের চণ্ডীদাসই না আত্মভুলান তন্ময়তার গান গাহিয়াছিলেন ?—

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে, মরণে জনমে জনমে

দেহ মন আদি, তোমাকে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন ॥”

ইংরাজীশিক্ষিত ভারতবাসীকে আত্মত্যাগ, সর্ব্বত্যাগ, দেহত্যাগ, “লাজ-মান-ভয়”-ত্যাগ, জীবন-যৌবন-ত্যাগ, কাম-কাঞ্চন-কীর্ত্তি-ত্যাগ শিক্ষা দিবার জন্য কবি রবীন্দ্রনাথ অশেষভাবে বৈষ্ণবীয় ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখান নাই কি?

একজন নূতন কবি ‘তন্ময়ে’র গান গাহিয়াছেন—

“কি আরাম ও গো তায়
সব সুখ দুখ পড়িছে লুটিয়া
একটি ভাবের পায়।”

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই তন্ময়তার, এই বৈষ্ণবীয় ভক্তির অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। আধুনিক বঙ্গভাষায়—আজকালকার নূতন ছন্দে, নূতন শব্দসম্পদে—বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের আত্মত্যাগী প্রেম, ও ঘরবাড়ী-ছাড়ান এবং জীবন-বিসর্জ্জন-করান তন্ময়তাই রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে প্রচার করিয়াছেন,—এ কথা বলিলে কোন অত্যুক্তি হইবে না। আজকাল পাশ্চাত্যশিক্ষিত ভারতসন্তান ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Immortality Ode এবং টেনিসনের

পরায়ণতা আদর করিতে শিখিয়াছে ভাল কথা! রবীন্দ্রনাথ সেই "The child is the father of the man"-তত্ত্বকে, সেই "From God who is our home"-তত্ত্বকে, সেই "Behind the veil"-তত্ত্বকে কিরূপ গভীর ও ব্যাপকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন দেখ। যাঁহারা ইংরাজীনবীশ, তাঁহারা ইংরাজী-সাহিত্যের এই দুইটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা খুলিয়া বসুন, আর যাঁহারা দেশীয় মহাত্মাদের কথাই শুনিতে চাহেন—তাঁহারা যে-কোন বৈষ্ণবপদাবলী খুলিয়া বসুন। আমাদের আধুনিক ভক্ত কবির বাণী শুনাইতেছি—নিজকে সর্ব্বত্র বিকাইয়া দিবার, বিলাইয়া দিবার, মিশাইয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা শুনাইতেছি—

"ওগো মা মৃণ্ময়ি
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই;
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত; বিদারিয়া
এ বক্ষপঞ্জর,টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সঙ্কীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার,—হিল্লোলিয়া, মর্ম্মরিয়া
কম্পিয়া স্খলিয়া, বিকীরিয়া বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে

আমারে ফিরায়ে লহ
সেই সর্ব্বমাঝে, যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্ররূপে—গুঞ্জরিছে গান
শত লক্ষ সুরে, উচ্ছ্বসি উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গীতে, প্রবাহি যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে, ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু ;—
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি শ্যাম কল্পধেনু।"

এই "বসুন্ধরা"-কবিতাটাকে 'যেন তেন প্রকারেণ' চোঁথা ইংরাজী গদ্যে প্রচার করিলেও ভক্তি-সাহিত্য হিসাবে "Immortality"কে কাণা করিয়া দিবে। জীবনযৌবন-দেহমনপ্রাণ এ সব বিসর্জ্জন করিয়া "সর্ব্বমাঝে" তন্ময় হওয়া যুগযুগান্তর-ব্যাপিনী ভক্তি-সাধনার—জাতিগত অভ্যাসের—ফল। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-রামপ্রসাদের উত্তরাধিকারীর পক্ষে নিজেকে এইরূপ সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাওয়া অতি সহজ। বিলাতী কবি অতদূর উঠিতে পারেন নাই। ওয়ার্ডসওয়ার্থ 'প্রাণ'-'গান'-'নৃত্য'-'চিত্ত'-'বেণু'র মূল কারণ ও উৎস-স্বরূপ 'শ্যাম কল্পধেনু'র নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্যের পক্ষে খুব জোর—"Obstinate questionings of sense and outward things," অথবা Heaven lies about us in our infancy," এবং—

"To me the meanest flower that breathes can give

কিন্তু প্রায়ই তাঁহার "Another race hath been, and other palms are won;" এবং "Gone is that vision, the melancholy dream." ভক্ত রাধার স্বপ্ন এরূপ ভাঙ্গিত না। যে নেশা ভাঙ্গে তাহার মূল্য কতটুকু? যে ভাবুকতার জন্য পরে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় অথবা অনুতাপ করিতে হয়, তাহা আবার ভাবুকতা?

ভক্তির এবং তন্ময়তার স্তর আছে—গভীরতম তন্ময়তা ও ভক্তিযোগ ভারতবর্ষই বুঝেন, বিলাতীর এখনও সাধ্য নাই। ওয়ার্ডসওয়ার্থ রাধার ন্যায় তমালের শাখায় পরিণত হইতে চাহেন নাই—যমুনার কাল জলে গা ঢালিতে পারেন নাই—খাঁটি প্রকৃতি-পূজক হইতে পারেন নাই। যে-কোন হিন্দু সহজেই তাহা পারেন। প্রতিভাবান্ রবীন্দ্রনাথও পারিয়াছেন। কেন পারিয়াছেন বলিতেছি।

ভক্তি-তত্ত্বে প্রকৃতি-পূজা

ভারতবর্ষের ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছ কি, এবং সেই ভক্তিশাস্ত্রে প্রকৃতির স্থান উপলব্ধি করিয়াছ কি? বীরবর হনুমানের নেতৃভক্তি দেখিয়াছ কি? হিন্দু দেবতত্ত্বের আনুষঙ্গিক বাহন-তত্ত্ব বুঝিয়াছ কি? পশুপক্ষী, তরুলতা আমাদের দেব-দেবীগণের এত প্রিয় কেন বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছ কি? হরিপ্রিয়া তুলসীর মর্ম্ম এবং বিষ্ণুরূপী শালগ্রামশিলার মাহাত্ম্য কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? বৌদ্ধ জাতক সাহিত্যে বুদ্ধদেব

আমাদের জৈন বৌদ্ধ বৈষ্ণবের "জীবে দয়া" নিশ্চয়ই জান। আমাদের মীন অবতার, কূর্ম্ম অবতার, বরাহ অবতার, নৃসিংহ অবতার—এ সব কথা নিশ্চয়ই জান। আমাদের অহিংসা-তত্ত্বের কথা বোধ হয় শুনিয়াছ। কালিদাসের সীতাবর্জ্জন-অধ্যায়ে "অত্যন্তমাসীদ্রুদিতং বনেঽপি" পড়িয়া অবশ্যই অশ্রুজল ফেলিয়াছ। সীতাদেবীর "কুররীব বিগ্না" ক্রন্দনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত-প্রকৃতির, আমাদের বনদেবতার সমবেদনা ও আকুল রোদন কখনও তোমরা ভুলিতে পারিবে না। আমাদের প্রাচীন চিত্র-শিল্পের, ভাস্কর্য্যের, কারুকার্য্যের নমুনা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। তাহাতে বানর, হস্তী, মৃগ, গাভীর সখ্যভাব, উপাস্যভাব, শিষ্যভাব বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ। ছেলেবেলায় যাত্রা-দলের গান নিশ্চয়ই শুনিয়াছ; ভারতের প্রকৃতিদেবী রামচন্দ্রের কত আত্মীয় তাহা ত জান—সীতাদেবীর পাতাল-প্রবেশও দেখিয়াছ।

"হে বনজ তরুলতা, হে বিহঙ্গকুল,
আমি রাম, সীতাশোকে হয়েছি আকুল।
হে দেব চন্দ্র সূর্য্য, হে দেব পবন,
জান কি এ পথে সীতা করেছে গমন?"—

রামচন্দ্রের এই প্রশ্নগুলির সার্থকতা কি? আর—

"দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি' আকাশে প্রদীপ জ্বালি।
আমাদের এই কুটীরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালী।"—

ইহারই বা অর্থ কি?

পারিলে, ভক্তি-তত্ত্বে প্রকৃতির মর্য্যাদা বুঝিতে পারিবে, হিন্দুর প্রকৃতি-পূজা বুঝিতে পারিবে; তোমার ধারণা জন্মিবে,—প্রকৃতিদেবী, পশুপক্ষী, তরুলতা, কীটপতঙ্গ, নদী-সাগর, অনল-অনিল এ সব ভক্তের কত পবিত্র, কত আত্মীয়,— এ সব হিন্দুর জীবন কতকাল হইতে কতখানি অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। তবেই বুঝিবে—কেন হিন্দু ভক্তগণ জলবায়ুর সঙ্গে, বিশ্বদেবতার সঙ্গে এক হইয়া মিশিতে চাহেন, পঞ্চভূতে মিলিয়া রহিতে চাহেন, কেন সাধক-শ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ বানর সাজিয়াও ভগবানের আরাধনা করিতে ভাল বাসিতেন। তবেই বুঝিবে—কেন স্বদেশ-সেবক দেশের মাটীর সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিতে চাহেন—দেশের মাটীকে পূজা করিতে চাহেন। তবেই বুঝিবে কেন মানবসেবক কৃষকের সঙ্গে কৃষক হইতে চাহেন, দীনদরিদ্রদুঃখীর কুটীরে জীবন অতিবাহিত করিতে চাহেন—কেন তিনি জগতের সর্ব্বত্র কর্ম্মক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র খুঁজিয়া পান। তবেই বুঝিবে কেন ভক্ত মাত্রেই প্রকৃতির পূজা করেন।

তবেই বুঝিবে কেন দ্বিজেন্দ্রলালের ইচ্ছা ছিল "আমার এই দেশেতেই জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি।" তবে বুঝিবে কেন রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছেন—"আঁখি মেলে তোমার আলো, দেখে আমার চোখ জুড়াল; ঐ আলোতে নয়ন রেখে মুদ্‌ব নয়ন শেষে।" তবে বুঝিবে কেন বিবেকানন্দ প্রচার করিয়াছেন "দরিদ্র নারায়ণের" পূজা। তবেই বুঝিবে কেন ভক্ত সন্ন্যাসী

আমার শৈশবের শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, বার্দ্ধক্যের বারাণসী।" তবেই বুঝিবে কেন বঙ্কিমচন্দ্র গাহিয়াছেন—"সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাম্, শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত-যামিনীং ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীং, সুহাসিনীং সুস্মিতাং।" তবেই বুঝিবে কেন যোগীন্দ্রনাথ তোমার বাল্যাবস্থায় শিখাইয়াছেন—

"জনক যেমন দুহিতারে পালেন যতনে
তেমতি এ হিমাচল দুহিতা-ভারতে
জাহ্নবী-যমুনারূপা স্নেহধারা দানে
পালিছেন সযতনে। * * *
বিধাতার কাছে মাগ এই বর বৎস
মাতৃসম যেন পার পূজিবারে
নিত্য বঙ্গভূমি মায়ে।"

ভক্ত ও প্রকৃতি-পূজক হইলেই—

"নির্ঝরের ঝরঝরে পত্রের মর্ম্মরে শুনিবে স্বরগ গীত।"

ভক্ত ও প্রকৃতি-পূজক হইলেই স্বদেশ সম্বন্ধে বুঝিবে—

"নন্দনকাননে কিবা শোভা ছার, * * *
স্বর্গ হ'তে যে মহা গরীয়ান্।"

ভক্তিতত্ত্বের এত কথা বুঝিলে তবে রবীন্দ্রনাথের "বসুন্ধরা" বুঝিতে পারিবে। ভক্তিযোগের সঙ্গে প্রকৃতির এতখানি সম্বন্ধ বুঝিলে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র প্রকৃতি কাব্য 'জলবৎ তরল'

গভীরতম ভাবগুলি তোমার হৃদয়ে আসন পাইয়া থাকে, তাহা হইলে কবিবরের "হিল্লোলিয়া" নদী হইয়া যাওয়া, মর্ম্মরিয়া বায়ু হইয়া যাওয়া, কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী হইয়া যাওয়া, আরব দেশের বেদুইন হইয়া যাওয়া—এ সব কল্পনা হৃদয়ঙ্গম করিতে কিছুমাত্র কষ্ট পাইবে না।

এই সব নদীপর্ব্বত, পশুপক্ষী, লতাপাতা, ফুল-জল ভক্তের এত পবিত্র, এত অন্তরঙ্গ বন্ধু কেন জান? ভক্তিশাস্ত্রে প্রকৃতি-পূজা স্থান পাইল কেন জান? ইহারা মানুষেরই মত সচেতন বলিয়া—ইহারা আমাদেরই সুখদুঃখ, দাস্য-সখ্যের অনুভব করিতে পারে বলিয়া। মানুষ যেরূপ ভগবদ্‌ভক্ত হইয়া উঠিতে পারে ইহারাও সেইরূপ ভক্ত হইয়া উঠিতে পারে। ইহাই হিন্দুর বিশ্বাস—ইহাই হিন্দুর ধারণা—ইহাই হিন্দুর সংস্কার—ইহাই হিন্দুর বিজ্ঞান, ইহাই হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বপুরাতন আবিষ্কার। আর, দীনদরিদ্র, কুলী মজুর, মুচিম্যাথর,—তাহারাও মানুষ, তাহারা সংসারের ওঁছাবাছা জীব নয়। নাই বা থাকিল তাহাদের গাড়ী-জুড়ি, ডিগ্রী-পাগড়ী—নাই বা থাকিল তাহাদের শিক্ষার ফোড়ন আর সভ্যতার আড়ম্বর। তাহাদেরও হৃদয় আছে, তাহাদেরও প্রাণ আছে, তাহাদেরও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আছে, তাহাদেরও ভক্তি আছে, তাহাদেরও আন্তরিক ব্যাকুলতা আছে। এই জন্যই ভগবান্ কৃষ্ণ শ্রীমান্ ও বিভূতিমান্ পদার্থের তালিকায় বিশ্বচরাচরের কোন বস্তুই বাদ দেন নাই। এই জন্যই

দিয়াছেন,—পশু-অবতারও তাঁহার উপেক্ষিত হয় নাই। প্রকৃতি-পূজা, মানব-পূজা ও বিশ্ব-পূজা সম্বন্ধে গীতার উদাত্ত ঘোষণা এই—

"শুন, সখা, তবে ভগবান্ ক'ন,
তোমার মনের প্রীতির কারণ
বিভূতি আমার করিহে কীর্ত্তন,
অবহিত হ'য়ে শুনহ এবে।

*　　*　　*

বিষ্ণু আমি, জিষ্ণু আদিত্য মণ্ডলে,
রবি অংশুমান্ জ্যোতিষ্ক সকলে,
আমিই মরীচি মরুতের দলে,
নক্ষত্র-নিকরে সুধাংশু আমি।

*　　*　　*

শিখরীতে মেরু উন্নত-শিখর,
বসুতে পাবক আমিই হই;

*　　*　　*

স্থির জলাশয়ে সরিতের পতি,
অসীম আকার ধরিয়া রই।

*　　*　　*

স্থাবরের মধ্যে গিরি হিমাধার

মন্থন করিলে ক্ষীরোদসাগর
অমৃতের তরে অসুর অমর,
উচ্চৈঃশ্রবা নামে যে ঘোটক-বর,
করী ঐরাবত উঠে তাহাতে,
আমি সে ঘোটক, সেই করিবর ;

❊ ❊ ❊

কামধেনু আমি ধেনুর ভিতরে

❊ ❊ ❊

বাসুকীও আমি উরগগণে

❊ ❊ ❊

আমি মৃগরাজ মৃগকুল বনে
বিনতা-নন্দন বিহগদলে ;
বেগগামিগণে আমি সমীরণ,
শস্ত্রধরে রাম, পবনে পাবন,
মীন মধ্যে আমি মকর ভীষণ
ভাগীরথী আমি প্রবাহ জলে ।

❊ ❊ ❊

চরাচরে কিছু নাহিক এমন
আমা ছাড়া যাহা থাকিতে পারে ।”

এই বিশ্বাসেই, এই ভক্তিতেই হিন্দু পৃথিবীর সচেতন-অচেতন—গঙ্গাগোদাবরী হিমাচল-বিন্ধ্য—সকলই পবিত্র মনে

করে—মানুষকে অবতার ভাবিতে পারে, দেবতাকে মানুষের আকার দেয় ; প্রকৃতির আরাধনা করে—প্রকৃতির সঙ্গে এক হইয়া থাকিতে চায়। ভক্তের প্রকৃতি-পূজা বুঝিলে ? এই জন্য—

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরেই ঠেকাই মাথা।

তোমাতেই বিশ্বময়ীর, বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"—

—ইহা কবিতার পদমাত্র নয়—কষ্ট কল্পনা করিয়া মাথা খাটাইয়া একটা কঠিন দর্শনবাদের অবতারণা নয়,—তোমাদের Utilitarian philosophy এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানের একটা সত্য প্রচার নয়, Geology, Botany, Zoology আওড়াইয়া দেশের natural resources বুঝান নয় ! ইহা জ্ঞানযোগ নয়, কর্ম্মযোগ নয়, ভক্তিযোগ—ভক্তিশাস্ত্রের প্রকৃতি-পূজা। যে ভক্তিযোগের দৃষ্টান্ত রামায়ণে পাও, কালিদাসে পাও, জৈনশাস্ত্রে জাতকশাস্ত্রে পাও, গীতাতে পাও, মধ্ব-রামানুজাচার্য্যের দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতে পাও ; যে ভক্তিযোগ কবীর-তুলসীদাস-তুকারামে পাও, যে ভক্তিযোগ মধ্বাচার্য্য-শিষ্য প্রেমাবতার চৈতন্যদেবে পাও, যে ভক্তিযোগ চৈতন্যপাদপদ্মপ্রসূত ভক্তিগঙ্গারূপ বৈষ্ণবপদাবলীতে পাও ; যে ভক্তিযোগ রাধাশ্যামের প্রেম-সাহিত্যের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছে, যে ভক্তিযোগ আজ পর্য্যন্ত ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতার দৈনিক জীবন পরিচালিত করিতেছে, সেই ভক্তিযোগই

করিতেছেন। "বসুন্ধরা"র প্রকৃতি-পূজক ভক্ত কবিবর বলিতে অধিকারী—

"সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভাল বেসে।"

কেননা তিনি ভারতবর্ষকে গভীরভাবে, ভক্ত ভাবে, প্রকৃত হিন্দুভাবে বুঝিয়াছেন। তিনি বঙ্গসাহিত্যে আমাদের বৈষ্ণবীয়-ভক্তি পুনঃ প্রবর্ত্তন করিলেন। রবীন্দ্রের প্রকৃতি-পূজা আমাদের সনাতন ভক্তি-সাধনারই অন্যতম অঙ্গ।

এখন ভক্তিযোগের প্রভাব দেখাইতেছি। তন্ময়তার সাহস দেখ—বৈরাগ্যের শক্তি দেখ—ত্যাগী আত্মার বিপুল উদ্যম দেখ—"মৃণ্ময়ী"র প্রকৃত সাধকের, "শ্যাম কল্পধেনু"র যথার্থ ভক্তের অসীম ক্ষমতা দেখিয়া রোমাঞ্চিত হও—

"ভাঙ্গরে হৃদয়, ভাঙ্গরে বাঁধন,

* * *

সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পরে আঘাত কর ;
মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ,
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ,
উথলি যখন উঠেছে বাসনা,
জগতে তখন কিসের ডর ?"

"জগতে তখন কিসের ডর ?"—ভক্ত ভিন্ন, বৈষ্ণবের রাধা

ভিন্ন, যথার্থ প্রেমিক ভিন্ন এ কথা আর কেহ বলিতে পারেন না। "Bread and Butter philosophy"তে, খাওয়া-পরার সুখ-ভোগে থাকিয়া, "সুখময় নীড়ে" বসবাসের ফলে—টাকা-পয়সা-মান-ধন-কাম-কাঞ্চন-কীর্ত্তিকে জীবনের ধ্রুবতারা করিয়া কেহ প্রেমিক হইতে পারে না—ভক্ত, সাধক, প্রকৃতি-পূজক হইতে পারে না—মৃণ্ময়ী মাতার "মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত" হইয়া থাকিতে পারে না—"দিগ্বিদিকে আপনারে বিস্তারিয়া" দিতে পারে না। সকলে ইহা বুঝিবে না। এ অসাধ্য সাধন একমাত্র ভক্তই বুঝেন—যিনি ভগবানের করুণালাভ করিয়াছেন—যে করুণায়

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।"

এইবার দেখ সাধক কিরূপে গিরি লঙ্ঘিতেছেন—প্রকৃতিপূজক কিরূপে বিশ্ব-রচয়িত্রী শক্তির সঙ্গে এক হইতেছেন—ভক্ত কিরূপে "সেই সর্ব্বমাঝে" ফিরিয়া যাইতেছেন। "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" পড়।

"আমি ঢালিব করুণাধারা, আমি ভাঙ্গিব পাষাণ-কারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া, আকুল পাগল পারা।

* * *

শিখর হইতে শিখরে ছুটিব, ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খল খল, গেয়ে কল কল, তালে তালে দিব তালি।
তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া—যাইব বহিয়া—যাইব বহিয়া—
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া, গাহিয়া গাহিয়া গান,

* * *

“কে আসিবি কে আসিবি, কে তোরা আসিবি আয়!
পাষাণ বাঁধন টুটি, ভিজায়ে কঠিন ধরা,
বনেরে শ্যামল করি, ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা,
সারা প্রাণ ঢালি দিয়া, জুড়ায়ে জগৎ হিয়া
আমার প্রাণের মাঝে কে আসিবি আয় তোরা।”
“আমি যাব,’ আমি যাব’—কোথায় সে, কোন্ দেশ—
জগতে ঢালিব প্রাণ, গাহিব করুণা গান।”

পাঠকগণ, তোমরা পণ্ডিত, আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি-ভক্তি কিছু নাই। পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে এই ভক্তি-কবিতার, এই প্রকৃতি-পূজার জুড়ি যদি বাহির করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমাদের কেনা হইয়া থাকিব—এ ঋণ আর জীবনে ভুলিব না।

আজকাল আমাদের দেশে Inductive method-এ শিক্ষা দিবার প্রণালী প্রচারিত হইতেছে। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের “নির্ঝর” একবারে বুঝিতে অসমর্থ, তাঁহারা এই কবিতার শিশু-সংস্করণ “নদী”টা প্রথমে পড়িয়া লইবেন। তাহা হইলে নির্ঝরে সহজেই “আরোহণ” করিতে পারিবেন। আর বাস্তবিক পক্ষে, ভাবুক কবিগণের অনেক কাব্যই এইরূপে আরোহ-পদ্ধতি অনুসারে বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মসঙ্গীতে ভক্তি দেখিলে—প্রকৃতি-সাহিত্যে ভক্তি দেখিলে। এবার আর একটা কথা বলিব। আমাদের বাঙ্গালীর আধুনিক “জাতীয় সঙ্গীত”গুলি প্রায় সবই ভক্তি-সাহিত্য। যে ভক্তি, প্রেম

ত্যাগ, বৈরাগ্য, ব্যাকুলতা, আধ্যাত্মিকতা পূর্ব্বে আমরা রাধা-কৃষ্ণে অর্পণ করিতাম, হর-গৌরীতে অর্পণ করিতাম, শ্যামামায়ে অর্পণ করিতাম, সেই ভক্তি, প্রেম, ত্যাগ, বৈরাগ্য, ব্যাকুলতা, আধ্যাত্মিকতারই কিয়দংশ আমরা আজকাল স্বদেশের ধূলির প্রতি অর্পণ করিতেছি—স্বদেশের লোকের প্রতি, সাধারণ-জনগণের প্রতি অর্পণ করিতেছি, স্বদেশের নদী-উপবন, আকর-সমীর, পশু-পক্ষী, তরু-লতায় অর্পণ করিতেছি—স্বদেশের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানে অর্পণ করিতেছি। জাতীয় সঙ্গীত আমাদের সনাতন ভক্তিতত্ত্বেরই এক অধ্যায় মাত্র। ইহা নূতন আমদানী মালও নয়, নূতন আমদানী ভাবও নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার সাহারায় আসিয়া আমাদের ভক্তিগঙ্গা শুকাইয়া যায় নাই—অথবা অন্তঃসলিলা সরস্বতীর ন্যায় কেবল যোগী-ঋষি-মুনিগণেরই বোধগম্য হইয়া রহে নাই! তুমি আমি সকলেই সেই ভক্তি দেখিতে পাইতেছি—শ্যামামায়ের সঙ্গে, রাধারাণীর সঙ্গে, গৌরীমাতার সঙ্গে, আমাদের দেশমাতাও মন্দিরে মন্দিরে পূজা পাইতেছেন—আমাদের সনাতন দেবী-সংসারে জননী জন্মভূমি পরিবারভুক্ত হইয়াছেন।

আমাদের দেবতারা অংশীদারের উৎপত্তিতে দুঃখিত হন না—বহুযুগে বহু দেবতা আমরা গড়িয়াছি। শোপেনহোয়ার বলিতেন Mono-theistic gods are jealous gods, অর্থাৎ তথাকথিত

হিন্দুর দেবদেবীগণ সহৃদয় উদার, যে কোন প্রণালীতে তাঁহারা ভক্তের অর্ঘ্য গ্রহণ করেন। আমরা তাঁহাদিগকে সপরিবারে সবাহনে পূজা করি, ঘট-পট, আটচালা, দুয়ার, হাতাবেড়ী, প্রদীপ পর্য্যন্ত পূজা করি, আবার তাঁহাদিগকে ভিন্ন ভিন্নও পূজা করি ; ইহাতে তাঁহাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের ভক্তিতত্ত্ব বুঝিলে ? বুঝিলে কেন আমরা দেশের মাটিকে মা বলিয়া ডাকিতে পারি ? বুঝিলে কেন "বন্দে মাতরং" আমাদের সনাতন ভক্তি-শাস্ত্রেরই একটি মন্ত্র ?

এইবার পাশ্চাত্য জাতীয় সঙ্গীতগুলির সঙ্গে তোমাদের জাতীয় সঙ্গীত মিলাইয়া লও। দেখিবে—পাশ্চাত্য সাহিত্য কত নীচে পড়িয়া রহিবে। আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত, ফরাসীর বিপ্লবসঙ্গীতও তোমাদের ভক্তিযোগপ্রসূত স্বদেশী গানের কাছে হতপ্রভ—নকড়া-ছকড়া। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বিরোধ-তত্ত্ব ও জাগতিক উন্নতিতত্ত্ব আমাদের এই ভক্তি-গঙ্গায় ডুবিয়া যাইবে। আমরা দ্বন্দ্ব ভাবিতে পারি না, সংসারের উন্নতিটাকেই একমাত্র চরম সত্য মনে করিতে পারি না। আমরা ভক্তিদ্বারা, প্রেমের দ্বারা নিজকে ভুলিতে চাই—ফল যাহাই হউক। আমাদের রবীন্দ্র-নাথ এই নূতন ভক্তিতত্ত্বেরও একজন বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাস।

কবিবরের শাক্তভাব

রবীন্দ্রনাথ শাক্তই কি বড় কম? একজন বাঙ্গালী সাধক গাহিয়াছেন—

"শ্মশান ভালবাসিস্ বলে শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচ্‌বি ব'লে নিরবধি।
মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে, রাখিয়ে মা পদতলে,
নাচ দেখি মা তালে তালে
হেরি আমি নয়ন মুদি॥"

আর একজন শাক্ত কবি 'জগদ্ধাত্রীপূজা'য় গাহিয়াছেন :—

"জননী মোদের জগদ্ধাত্রী, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্রী,
ঈপ্সিত বর-অভয়-দাত্রী, অধিষ্ঠাত্রী ত্রিলোকীর।
শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত মোরা, অভয়া চরণে নম্রশির,
শুধু মায়ের চরণে নম্রশির।"

কবি রবীন্দ্রনাথও এইরূপ শাক্ত, এইরূপ শক্তিশিষ্য।
আর একজন হিন্দু কবি গাহিতেছেন :—

"ছুটে চল ছুটে চল, হে পদ্মা আমার
পূর্ণ হোক সংহারিণী লীলা।
অন্ধগতি বন্ধহারা নৃত্য তালে তালে

নিষ্ঠুর ভ্রূভঙ্গে তব চূর্ণ হয়ে যাক্
তরুগ্রাম নগর-কান্তার,
লুপ্ত হয়ে যাক্ শোভা সমস্ত সুষমা ;—
ধন্য হোক্ বাসনা তোমার !
কালী তুমি করালিনী,
নমি তব পায়,
হিয়া মোর জবাঞ্জলি তায় ।"

খুঁজিয়া দেখিলে এরূপ শাক্তভাব রবীন্দ্রনাথে অনেক পাইবে। দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া প্রবন্ধ বড় করিব না। রবীন্দ্রনাথ গাহিতেছেন—

"আমার প্রভুর চরণতলে
শুধুই কিরে মাণিক জ্বলে ?
ও তাঁর পায়ে পায়ে বাজে কত
কঠিন মাটির ঢেলা রে !
পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দেরে ?
খসে যাবার, ভেসে যাবার-ভাঙবারই আনন্দেরে?"

রবীন্দ্রনাথ "সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে"ও এই শক্তিপূজার মন্ত্রই প্রচার করিয়াছেন—

"কাঁদে গ্রহ, কাঁদে তারা,
শ্রান্ত দেহে কাঁদে রবি,

আকুল বিশ্বের কণ্ঠস্বর ;—
"'জাগ' জাগ' জাগ' মহাদেব,
কবে মোরা পাব অবসর !

* * *

জগতের আত্মা কহে কাঁদি
'আমারে নূতন দেহ দাও ;
প্রতিদিন বাড়িছে হৃদয়,
প্রতিদিন বাড়িতেছে আশা,
প্রতিদিন টুটিতেছে দেহ,
প্রতিদিন ভাঙ্গিতেছে বল।
গাও দেব মরণ-সঙ্গীত,
পাব মোরা নূতন জীবন।'

* * *

প্রলয়পিণাক তুলি করে ধরিলেন শূলী,—
পদতলে জগৎ চাপিয়া
জগতের আদি-অন্ত থরথর থরথর,
একবার উঠিল কাঁপিয়া।

* * *

উঠিলরে মহাশূন্যে গরজিয়া তরঙ্গিয়া
ছন্দোমুক্ত জগতের উন্মত্ত আনন্দ কোলাহল।
ছিঁড়ে গেল রবিশশী গ্রহতারা ধূমকেতু

চন্দ্রসূর্য্যে গুঁড়াইয়া চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে গেল।
মহা অগ্নি জ্বলিল রে,—
আকাশের অনন্ত হৃদয়—অগ্নি অগ্নি শুধু অগ্নিময়।
মহা অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া জগতের মহা চিতানল।
খণ্ড খণ্ড রবি শশী চূর্ণ চূর্ণ গ্রহতারা,
বিন্দু বিন্দু আঁধারের মত বরষিছে চারিদিক হ'তে,
অনলের তেজোময় গ্রাসে নিমেষেতে যেতেছে মিশায়ে।"

হেমচন্দ্রের "দশমহাবিদ্যা" কে না পড়িয়াছে ?—

"একে একে জগতের আভরণ খসিল।
চন্দ্র তারা রশ্মিমেঘ অভ্রসনে ডুবিল॥
গিরি নদ পারাবার ছিল যত ভুবনে।
অনুক্ষণ অদর্শন মহাদেব শোষণে॥
স্বর্গপুরি রসাতল হিমালয় ছুটিল।
ধারা-হারা বসুন্ধরা শিব অঙ্গে মিশিল॥"

—ইহা হইতে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য কোথায় ? আজকালকার সভ্য বাঙ্গালায় যাত্রা উঠিয়া গিয়াছে! রসিক চক্রবর্ত্তীর "কালীকেতু" পালা আর শুনিতে পাই না। নাই বা পাইলাম—রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় আমরা কালকেতুর গান শুনিয়া থাকি ;

"মা তোর দুর্ল্লভ পদপল্লব দে মা দে মা
মাথে, ক্ষেমঙ্করি।
(আমি শুনেছি শুনেছি মাগো)

সেইরূপ রণ-বেশে নাচ হৃদি রঙ্গভূমে শঙ্করী ॥
আমি চাই না শক্তি দে মা ভক্তি
স্বগুণে পরমেশ্বরী ॥
হয়ে হৃদি-পদ্মাসনা বিলাস-বাসনা নাশ মা
আমার শুভঙ্করী।"

ইহার সঙ্গে মিলাইয়া লও—

"কিসেরি বা সুখ কদিনের প্রাণ ?
ঐ উঠিয়াছে সংগ্রাম-গান।
অমর মরণ রক্ত চরণ নাচিছে সগৌরবে ॥"

কবিবরের শাক্তভাব দেখিয়া আমাদের সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের কথা মনে পড়ে—

"এবার শ্যামা তোমায় খাব।
তুমি খাও কি আমি খাই মা,
দুটোর একটা ক'রে যাব ॥"

আর মনে পড়ে—বিবেকানন্দের "নাচুক সেখানে শ্যামা।" ইহাকে বলে সাধনা।

ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ যাহাই হউন, ধর্ম্মবক্তা রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে যাহাই বক্তৃতা করুন, কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের সনাতনরীতির শৈবশাক্ত-তান্ত্রিক।

এই বৈরাগ্যের বাণী—এই শ্মশানে ঘর করার প্রবৃত্তি—কালী-সাধনার চূড়ান্ত পরিচয়,—ভরাবিশ্বাসে শক্তি-শিষ্যের ধরায়

"বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে, কে মোর আত্মপর ?
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর ?
কিসেরি বা সুখ, কদিনের প্রাণ ?
ঐ উঠিয়াছে সংগ্রাম-গান।
অমর মরণ রক্ত চরণ নাচিছে সগৌরবে।"

—ইহা বৈষ্ণবের কৃষ্ণপ্রেম, কি শাক্তের কালীপূজা তাহা জানি না। আমরা হিন্দু—আমরা বুঝি "এত নয় নন্দের তনয়, দুষ্ট বনমালী" ; আমরা জানি "যেই কৃষ্ণ সেই কালী।" এজন্য আমরা বলিব,—রবীন্দ্রনাথ আজ বৈষ্ণব, আজ শাক্ত—সাম্প্রদায়িক শব্দব্যবহারে যদি কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকে, তাহা হইলে বলিব কবিবর ভারতবাসীকে আজ সনাতন বৈরাগ্যের শিক্ষা দিতেছেন। বুদ্ধদেব রাজসিংহাসন তুচ্ছ করিয়াছিলেন যে জন্য, চৈতন্যদেব সংসার ছাড়িয়া পাগল হইয়াছিলেন যে জন্য, যীশুখৃষ্ট জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন যে জন্য, "পঞ্চ-নদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে" শিখ্ গুরু আত্মবলি দিয়াছিলেন যে জন্য, বাঙ্গালী কবি ভারতবাসীকে (এবং সম্প্রতি সমগ্র মানবজাতিকে) সেই মুক্তির বাণী নূতন ভাষায় শুনাইতেছেন। পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে যখনই যে কোন ব্যক্তি "সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে" এই কথা কার্য্যে পরিণত করিবার উপযুক্ত হইবেন, যুগে যুগে দেশে দেশে তাঁহাকে রবীন্দ্রনাথের এই বাণীর মর্ম্মই উপলব্ধি করিতে হইবে। সেই সকল সাধক ভক্ত বীরপুরুষগণকে সংসারের নিকট আজ

কাঞ্চনের নিকট, ভোগ্যবস্তুর নিকট, মায়া-মমতার নিকট, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের নিকট বলিতে হইবেঃ—

"অরুণ তোমার তরুণ অধর, করুণ তোমার আঁখি।
অমিয় রচন সোহাগ বচন অনেক রয়েছে বাকি।

* * *

আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর নির্ম্মম আমি আজি
আর নাই দেরি ভৈরব-ভেরী বাহিরে উঠেছে বাজি ॥

* * *

পাখী উড়ে যাবে সাগরের পার
সুখময় নীড় পড়ে রবে তার
মহাকাশ হ'তে ঐ বারে বার
আমারে ডাকিছে সবে ॥"

ত্রেতাবতার রামচন্দ্রকে জাতীয় জীবনের এক অতি বিষম সমস্যাস্থলে এইরূপ নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর হইয়া স্বকীয় সাধনার ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইয়াছিল। অমর কবি কালিদাস কর্ত্তব্যপরায়ণ রামচন্দ্রের কঠোর বৈরাগ্য মধুর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন—

"বভূব রামঃ সহসা সবাষ্পঃ
তুষারবর্ষীব সহস্য চন্দ্রঃ।
কৌলীনভীতেন গৃহান্নিরস্তা
ন তেন বৈদেহসুতা মনস্তঃ ॥"

জীবনোৎসর্গ—এই সকল বৃত্তিপ্রবৃত্তিগুলি একই ভাবের নামান্তর মাত্র—একই পদার্থের বিভিন্ন মূর্ত্তি—মানবচরিত্রগত অনুভূতি-পুঞ্জের এবং নিগূঢ় চিত্তপ্রবৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন বাহ্য প্রকাশ বা অভিব্যক্তি। "যারে বলে ভালবাসা, তারে বলে পূজা।" এই কথা মনে রাখিলে দেখিতে পাইবে শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণবে কোন প্রভেদ নাই, হিন্দু-মুসলমানে কোন দ্বন্দ্ব নাই। বৈরাগ্যের জগতে, স্বার্থত্যাগের জগতে, ভালবাসার জগতে, পূজা-আরাধনার জগতে ছোট-বড়, দীন-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রভেদ নাই, ধর্ম্ম-কলহ বা সাম্প্রদায়িক গোলমাল নাই।

পরং ত্যাগবলং বলম্

ভাবুকতার আর একটা দিক আছে। আমরা রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিয়াছি "যারে বলে ভালবাসা তারে বলে পূজা"। এখন আর একটি লক্ষণ বলিতেছি। এই পূজা, ভালবাসা, এই বৈরাগ্য, গৃহত্যাগের সঙ্গে মানবসেবা, লোকহিত, পরোপকার ও স্বদেশ-সেবা অভিন্নসূত্রে গ্রথিত। সকলগুলিই এক বৃন্তের বিভিন্ন ফল—এক শক্তির বিভিন্ন বিকাশ। যারে বলে আধ্যাত্মিকতা, যারে বলে বৈরাগ্য, তারেই বলে স্বদেশসেবা—তারেই বলে পরোপকার। ভাবুকতার এই তত্ত্ব না বুঝিলে বৈষ্ণব কবিগণকে বুঝিতে পারিবে না—মহাপ্রাণ রামপ্রসাদকে বুঝিতে পারিবে না—বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, তুকারাম, চৈতন্য, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, করমসিন, বিবেকানন্দ, টলষ্টয়, রবীন্দ্রনাথ কাহাকেই বুঝিতে পারিবে না।

ভাবুকতার চরম কথা নিজকে ভুলিয়া থাকা; নিজের অহঙ্কার খর্ব্ব করা; অহং-বিন্দুগুলি অনন্তসাগরে বিসর্জ্জন দেওয়া; চোখের সম্মুখে যাহা দেখিতে পাইতেছ, কাণ দিয়া যাহা শুনিতে পাইতেছ, তাহাকে সসীম ও নশ্বর জ্ঞান করা। যাহা দেখিতে পাইতেছ না, যাহা শুনিতে পাইতেছ না, ধরা-ছোঁয়া যায় না যাহা—সেই অসীম, অতীন্দ্রিয়, অনাদ্যন্ত, মানবচিন্তার

ন্যায় সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শন ভিন্ন সাধকের, ভক্তের, প্রেমিকের, ভাবুকের আর কোন গতি নাই।

"অনাদিমধ্যান্তমজমবৃদ্ধিক্ষয়মচ্যুতম্।
প্রণতোঽস্মি জগন্নাথং সর্ব্বকারণকারণম্॥"

অথবা,

"উপাধিগম্যোঽপ্যনুপাধিগম্যঃ
সমাবলোক্যোঽপ্যসমাবলোক্যঃ।
ভব্যোঽপি যোঽভূদভবঃ শিবোঽয়ং
জগত্যপায়াদপি নঃ সঃ পায়াৎ॥

ইহার নাম ধর্ম্মে ভাবুকতা। এই ভাবুকতা হিন্দুর মজ্জাগত। অনন্তদর্শনে চৈতন্যের উন্মাদ এবং ভূমানন্দ এই ভাবুকতারই অন্যতম লক্ষণ।

চৈতন্যদেবকে পাগল বলিতে চাও, বল—স্বদেশসেবককে পাগল বলিতে চাও, বল—ভালবাসাকে, সর্ব্বত্যাগকে পাগলামী বলিতে চাও, বল—প্রকৃতপক্ষে ইহার নাম ভাবুকতা। এই ভাবুকতা না বুঝিলে হিন্দুর চরম কথা বুঝিবে না।

রবীন্দ্রনাথ হিন্দুর এই সনাতনী ভাবুকতাই নানা উপায়ে দেখাইয়াছেন। তাঁহার আজীবন সাহিত্যসেবায় সেই ভাবুকতা প্রচার করিবার প্রয়াস দেখিতে পাইবে। এই তত্ত্ব মনে রাখিয়া সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হও, দেখিবে—

অত বলিতে পারি না। সর্ব্বত্রই এই প্রয়াসের ইতিহাস দেখিতে পাইবে। তাঁহার প্রেম-কাব্যে, তাঁহার প্রকৃতি-পূজায়, তাঁহার হাস্যকৌতুকে, তাঁহার ধর্ম্ম-বক্তৃতায়, তাঁহার সঙ্গীতে—ঐ এক কথার নাড়াচাড়াই দেখিতে পাইবে—"যারে বলে ভালবাসা তারে বলে পূজা।"

রবীন্দ্রনাথের ভাবুকতায় বৈষ্ণবের ভক্তি দেখিলে,—কালীর সাধনা দেখিলে—বীণাপাণির পূজা দেখিলে—বৈরাগ্যের উদাত্ত সঙ্গীত দেখিলে। এখন দেখ—ভারতে নবযুগের প্রবর্ত্তক, ভাবুকতার প্রতিমূর্ত্তি বিবেকানন্দের ভেরী-নিনাদ রবীন্দ্রনাথ কি মধুর কণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছেন :—

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তাহলে একলা চল রে।
যদি কেউ কথা না কয়, সবাই রহে
মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়,
তা হ'লে পথের কাঁটা তুই রক্ত মাখা
চরণতলে একলা দলরে।
একলা চল, একলা চল, একলা চলরে॥"

সাধনার পথে একলা তো যাত্রা করিলাম। কিন্তু বায়ু যে মধুর বহিবে এবং 'বেয়ে যাব রঙ্গে' তার তো কোন স্থিরতা নাই। তাই সাধকের জানা আবশ্যক যে, ভয় করিলে চলিবে

"শুনে তোমার মুখের বাণী,
আস্‌বে ঘিরি বনের প্রাণী •
হয়তো তোমার আপন ঘরের
পাষাণ হিয়া গল্‌বে না।
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।"

সংসারে আসিয়াছ একাকী—যাইবেও একাকী। তাহা হইলে আর অপরের সাহায্যের কথা ভাবিতেছ কেন? অন্য লোকে কি করিকে তাহার খবর লইতেছ কেন? প্রকৃত সাধক, সন্ন্যাসী, প্রেমিক কাহারও দিকে তাকায় না—দাগী, 'কলঙ্কী' হইতে লজ্জা বোধ করে না, নিজ নিজ অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিজ কর্ত্তব্য করিয়া যায়। ভক্ত জানেন "লাজ মান ভয়, তিন থাকতে নয়।" প্রেমিক জানেন :—

"কলঙ্কী বলিয়া ভাবে সব লোক
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥"

এরূপ তন্ময় না হইলে কি কখনও প্রকৃত ভাবুক হওয়া যায়? যাহা দেখিতে পাইতেছ, সংসারের যে সকল ভোগ বিলাসে প্রলুব্ধ হইতেছ, যে সকল দুর্ব্বলতা ও চরিত্রহীনতায় অন্ধ হইয়া রহিয়াছ, তাহা প্রত্যাখ্যান না করিলে "ভবিষ্যতের পানে আশা ভরা আহ্লাদে" কেহ কখনও তাকাইতে পারে কি? এই জন্যই

"তুই যদি একা ঐ ভাবে জীবন গঠন কত্তে পারিস্ তা'হলে তোর দেখাদেখি হাজার লোক ঐরূপ কত্তে শিখবে।"

ভাবুক রবীন্দ্রনাথ ঐ কথাই আবার বলিতেছেন—

"সকল মহৎ কর্ম্মে পরম প্রয়াসে
সকল চরম লাভে, দুঃখ কিছু নয়,
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব্ব ভয় ;

* * *

ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির,
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির ॥"

স্বার্থত্যাগ শিখাইবার জন্য, ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগাইবার জন্য এই কয় পংক্তি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা আবশ্যক।

একজন বিলাতী কবির বীণায় এইরূপই এক ঝঙ্কার উঠিয়াছিল। দুরন্ত আশার প্রভাবে, দুঃসাধ্য ব্রত-উদ্‌যাপনের আকাঙ্ক্ষায়, অসীম বাসনারাশির তাড়নায় ভাবুক গাহিয়াছিলেন—

We look before and after
And pine for what is not ;
Our sincerest laughter with some pain is ever fraught ;
Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.

এই sadকে, বিষাদকে যদি ত্যাগ করিতে চাও, তাহা হইলে সেই sweet সেই অমৃতের আস্বাদ পাইবে না, সেই

সেই অসীম আনন্দ, মানব-জীবনের সেই উচ্চতম লক্ষ্য পাইবার জন্য কবিবর ক্ষুদ্রত্বও সসীম ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিতে চাহিতেছেন—

"নিমেষ তরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে' জীবন উচ্ছ্বাসে।
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিতে পান,
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ
ঊর্দ্ধ নীলাকাশে!
থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণ
আম্রবন ছায়ে,
সুপ্ত হয়ে' লুপ্ত হয়ে'
গুপ্ত গৃহবাসে।"

বিবেকানন্দের বজ্রকণ্ঠে যে সঙ্গীত-তরঙ্গ উঠিয়াছিল, দেখিতেছি রবীন্দ্রনাথও ললিতকলায় সেই ধ্বনিই বাঙ্গালীর জীবন-বেদ-রচনার জন্য দান করিয়াছেন। পরানুবাদ, পরানুকরণ, ক্ষুদ্রত্ব, পঙ্গুত্ব, নির্জ্জীবত্ব, কূপমণ্ডুকত্ব পরিত্যাগ করিয়া মানুষ হইতে হইবে—"সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর"কে সম্মুখে রাখিয়া জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যকলাপও পরিচালিত করিতে হইবে। ইহাই বিবেকানন্দ-রবীন্দ্র-সাহিত্যের বাণী। হেমচন্দ্রও "গগণের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধ'রে" কর্ম্মে অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিলেন।

কাব্যে বিপ্লব-তত্ত্ব বা আদর্শ-বাদ

সাহিত্য-সেবায় ভাবুকতা লইয়া আর একটা কথা বলিব। বর্ত্তমানকে ভাবুক কি চোখে দেখেন? যাহা নাই ভাবুক তাহা চাহেন, যাহা আছে তাহাতে তাঁহার সন্তোষ হয় না।

আমরা দেখিয়াছি, আধ্যাত্মিকতা দ্বারা, ভালবাসা দ্বারা, স্বদেশসেবা দ্বারা সর্ব্বত্রই ভাবুক অসীম ও-অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহেন। সসীমকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, অথবা বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র জীবনহীন গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া এবং সমাজের বাধাবিঘ্নগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া নূতন জগৎ, নূতন আলোক, নূতন বিশ্ব সৃষ্টি করাই ভাবুকের প্রকৃতি। বৈষ্ণব কবিদের রাধা এইরূপ বিপ্লব সাধন করিতেন—বিপ্লব সাধন না করিয়া, সোজা পথে চলিয়া, নরম হইয়া কেহ কখনও প্রেমিক হইতে পারেন নাই। এইরূপ বিপ্লব-সাধনের চিত্র আমরা ফরাসী দার্শনিক রুসোর সাহিত্যেও যথেষ্ট পাই। বর্ত্তমানের প্রতি এইরূপ অস্পৃহা, নূতনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, নূতন আদর্শ গড়িয়া তুলিবার প্রবৃত্তি—এক কথায় বিপ্লববাদ-প্রচার খানিকটা ইংরাজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থে, প্রচুর পরিমাণে শেলির কাব্যে আমরা দেখিতে পাই।

বিপ্লবের কথা শুনিয়া চমকাইও না। আমরা মারামারি রক্তারক্তি লড়াইয়ের কথা, স্বদেশ-আত্মার রাক্ষসীমূর্ত্তি-পরিগ্রহের

সর্ব্বমুখিনী উন্নতির আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত থাকে, আমরা সেই অন্তর্জ্জগতের ভাবের খেলার কথা বলিতেছি। কাটাকাটি কামড়া-কামড়ি অপেক্ষা তাহা অতি সূক্ষ্ম, গভীর ও ব্যাপক।

একজন বর্ত্তমান-ক্লিষ্ট ব্যথিত-পরাণ উদাসভাবে বেহাগ ধরিয়াছেন—

"সংসার, কি ভয় দেখাও আমারে ?
ভাল নাহি বাস যাব চলে দূরে।"

এই জন্যই—

"অত্যন্তবিমুখে দৈবে ব্যর্থে যত্নে চ পৌরুষে।
মনস্বিনো দরিদ্রস্য বনাদন্যৎ কুতঃ সুখম্॥"

—এইরূপে বর্ত্তমান হইতে, বাস্তব হইতে দূরে চলিয়া যাওয়া, বনবাসকেই শ্রেয় জ্ঞান করা—"মরণরে, তুঁহু মম শ্যাম সমান" এই ভাবিয়া 'বৃন্দাবন ধন' সকলই পরিত্যাগ করা—ইহার নাম বিপ্লব। ঘরবাড়ী ছাড়িতে পারিলেই মনে হইবে—

"আকাশের তারা ডাকিছে আমারে,
সমীরণ ডাকে আয় আয় ক'রে।
কে জানে কে মোরে প্রাণের ভিতরে
বলিছে সদাই সকলি তোমার।"

যখন সোজা পথের পথিক কেহ তোমার অশ্রুজল মুছাইবে না, তখন দেখিবে দুনিয়াই তোমার আত্মীয়—

"শ্যামলা ধরণী ধবলা যামিনী
শশী দিনমণি সুধার আধার,
সকলিই আমার।"

এইরূপে নিজকে পর করিয়া পরকে আপনার করার নাম বিপ্লব—এই বিপ্লব-বাদ সাহিত্যে নানা উপায়ে প্রচারিত হয়। মানব-চিন্তায় বিপ্লব নানা মূর্ত্তি গ্রহণ করে।

বিপ্লববাদী ভাবুকগণ হয় অতীতের গৌরব-"কথা" প্রচার করেন, না হয় ভবিষ্যতের আদর্শ সমাজ চিত্রিত করিয়া শান্তি পান। কেহ ভাব-রাজ্যে কল্পনার স্বদেশ, স্বসমাজ ও স্বধর্ম্ম গড়িয়া মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন। কেহ প্রকৃতিকে মানবীয় ভাব ও দেবভাব অর্পণ করিয়া তাঁহারই আশ্রয়ে জীবন মধুময় করেন।

এইজন্যই চরমপন্থী বৈষ্ণব কবির ভক্তি সঙ্গীতে প্রকৃতি-পূজার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। বিপ্লবের প্রতিমূর্ত্তি রাধার সংসার হয় কৃষ্ণময়, না হয় 'নাম'-ময়, না হয় প্রকৃতিময়। যমুনা, তমাল, কোকিল, ময়ূর, মেঘ, এই সবই রাধার পরম আত্মীয়। দেশ-বিদেশের অন্যান্য বিপ্লব-বাদী কবিগণও প্রকৃতিকে জীবন্ত মানুষ অথবা স্বর্গীয় দেবতারূপে কল্পনা করিয়া প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

সুতরাং বিপ্লব-বাদী ভাবুকতাময় কবিগণের নিকট প্রকৃতি খেলার সামগ্রী মাত্র নয়! কবিতা লিখিতে গেলে কতকগুলি গাছ-পাতা জীবজন্তু আনিয়া খাড়া করা প্রয়োজন,—এই জন্যই আদর্শ-প্রচারক ভাবুকের নিকট প্রকৃতি আসেন তাহা নহে। প্রকৃতিই আশাবাদী ভাবুকের আদর্শস্থানীয়া। জীবনময়ী প্রকৃতির বিশ্লেষণ করিতে যাইয়াই ভাবুকের দ্বারা সংসারের সকল তত্ত্ব প্রচারিত হয়। প্রকৃতিই বিপ্লব-বাদী কবির নিকট একমাত্র সত্য, তাঁহার জীবনের গঠনকর্ত্রী, তাঁহার শিক্ষাদাত্রী

—তাঁহার জন্মজন্মান্তরের প্রিয়সখী। বিপ্লব-বাদী কবিগণ প্রকৃতির সঙ্গেই কথা বলেন—প্রকৃতিকেই উপলক্ষ্য করিয়া দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, প্রেম সকল সমস্যার মীমাংসা করেন। আদর্শ-বাদী ভাবুকের প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতাগুলি এজন্য কখনও প্রাকৃতিক অর্থেই গ্রহণ করিতে পার, কখনও প্রেম ভালবাসার দৃষ্টান্তস্বরূপ বুঝিতে পার, কখনও কখনও বা ধর্ম্ম-তত্ত্বের মীমাংসা ভাবে বিবেচনা করিতে পার, কখনও স্বদেশ-সেবকের উদ্বোধন-সঙ্গীতের ন্যায় বিচার করিতে পার। ভাবুক কবির প্রকৃতি-বিষয়ক যে-কোন রচনায় নানা অর্থ দেখিতে, নানা তত্ত্ব বুঝিতে এবং নানা ভাবে সংসারের জটিল প্রশ্নগুলির সমাধান হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে ভাবুকের কাব্য বুঝা হইল না। পূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি—যারে বলে ভালবাসা তারেই বলে পূজা, তারেই বলে স্বদেশসেবা, তারেই বলে বৈরাগ্য। এখন বলিতেছি তারেই বলে বিপ্লব-বাদ, আদর্শ-বাদ, তারেই বলে প্রকৃতি-ভজনা।

সকলের ভাবুকতায় একই অভিব্যক্তি দেখিতে পাইবে তাহা নহে। এই নানা অভিব্যক্তির কোন স্থলে একটি, কোন স্থলে দুইটি, কোন স্থলে সবগুলিই হয় ত বর্ত্তমান। কিন্তু ভাবুকেরা প্রায় সকলেই—বিপ্লববাদী বর্ত্তমানের সংস্কারক। রাধা বিপ্লবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি নূতন করিয়া নূতন আদর্শে জগৎ গড়িতে চাহিয়াছিলেন। রুসো নূতন করিয়া সমাজ, শিক্ষা, রাষ্ট্র গড়িতে চাহিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ নূতন করিয়া গড়িতে চাহিয়া-

অপ্রীতি এবং আদর্শবাদই ভাবুকের স্বধর্ম্ম।

অতীতের স্মৃতি হইতে, ভবিষ্যতের আদর্শ হইতে, এবং কল্পনার রাজ্য হইতে বর্ত্তমানে শক্তিলাভ করাও যায়। তাহাও কম বাস্তব নয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যে অতীত কি "কথা" বলিয়াছেন তাহা সকলেরই জানা আছে। কবিবরের ভবিষ্যৎ আদর্শ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক-মুখে দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা,
ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে!
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে;

* * * *

কবি, তবে উঠে এস, যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে,—তবে তাই কর আজি দান;
বড় দুঃখ, বড় ব্যথা,—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার!—
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট! এ দৈন্য মাঝারে, কবি
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি!"

১৭৮৩-১৮৫২) রুশিয়ায় এই নূতন আদর্শ-বাদ, 'স্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি' আনিতেছিলেন—

"O sweet remembrance
Of that which has ceased to exist here below !
O strength of the soul, sweet hope
Of a better and unchanging life !
Blessed is he, who in the midst of wrecked
Ruins of this life cherishes you in his soul,
And by your aid the miseries of the present
Neither heeds nor takes to heart."

—এই আশা-তত্ত্ব, ভবিষ্যতে এই জ্বলন্ত-বিশ্বাস, এই বিপ্লবতত্ত্ব The Butterfly and the Flowers (১৮২৫ খৃঃ) নামক প্রকৃতি-বিষয়ক কাব্যে দেখিতে পাই।

এই রুশ ভাবুকের রচনায় রবীন্দ্রনাথের "অতীত, কথা কও" খুঁজিয়া পাওয়াও কঠিন হইবে না—

"And has the past for ever vanished, and have former days
That were so joyous left no trace behind them ?
O no ; never shall their strength be slain ;
To the heart the past is eternal,
And love survives the pang of separation ;
Death can boast no power over the heart."

জুকবস্কির যুগে আমাদের ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ

রুশ ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। জুকবসকি স্বয়ং ভাবুকতাময় জার্ম্মান্ ও ইংরাজী কবিতাবলীর একজন অনুবাদক ছিলেন।

জুকবসকির মৌলিক কবিতায়ও ভাবুকতার, আত্মার অমরতা সম্বন্ধে জ্ঞানের, বর্ত্তমানে অস্পৃহার, আশাতত্ত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। "যার কেহ নাই, সকলই তাহার"—এই বিপ্লববাদের সুর তাঁহার কণ্ঠে লাগিয়াই আছে—

"Everywhere we hear the familiar voice,
Everywhere we see the unforgotten face ;
O, the sweetness of the sacred thought,
That there, far off in the distant dale,
Thy angel, queen of beauty,
Alone with her grief,
Mourns and weeps her lover.
Even thither does the soul bear
The love and image of the dear one ;
Of these, friends, death can never rob us,
For there is life and love beyond the grave."

এই ভাবুকতা, এই আদর্শবাদ, এই আশার বাণী রুশ সাহিত্যের প্রাণ।

প্রকৃতি-পূজা বা স্বাধীনতার গান

প্রকৃতি-বিষয়ক কাব্যে পূর্ব্বে আমরা ভক্তিযোগ দেখিয়াছি—এখন বিপ্লব-বাদ বা আদর্শ-তত্ত্ব দেখিলাম। এ দুই-ই হিন্দুর সনাতন সাহিত্যধারা ও চিন্তাপ্রবাহের অন্তর্গত। ভারতবর্ষের চরমপন্থী বৈষ্ণব সাহিত্য এই জন্যই আমাদিগের এত নিজস্ব বোধ হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-সাহিত্য পাশ্চাত্য প্রকৃতি-পূজার অনুকরণ নয়—আমাদেরই ঘরের কথার আধুনিক সংস্করণ। এখন রবীন্দ্র-কাব্যের প্রকৃতি-তত্ত্ব আর একদিক হইতে বুঝিব।

বর্ত্তমানের নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতা এবং তথাকথিত সভ্যতার আড়ম্বর ও কৃত্রিমতা হইতে ভাবুকগণ দূরে সরিয়া থাকিতে চাহেন। এই কঠোরতা ও আড়ম্বর নগর-জীবনেই বেশী পুষ্ট হয়। কাজেই ভাবুকতার যে অভিব্যক্তিস্বরূপ আমরা কবির প্রকৃতিপূজা দেখিতে পাই, তাহারই আর এক পরিচয় তাঁহার পল্লী-সমাদর। বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতিদেবীর লীলা-নিকেতন পল্লীজীবনকে সরল, স্বাধীন, নৈসর্গিক, অকৃত্রিম এবং সুখময় বিবেচনা করা ভাবুক কবিগণের প্রকৃতি-পূজার একটি প্রধান অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাহার অসংখ্য পরিচয় আছে।—একটি চিত্র প্রদর্শন করিতেছি।

"বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধূ ধূ

দীঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দুধারে ঘন বন, ছায়ায় ঢাকা।
গভীর থির নীরে ভাসিয়া যায় ধীরে,
পিক কুহরে তীরে অমিয় মাখা।
পথে আসিতে ফিরে আঁধার তরুশিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা।

অশথ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি'
সেখানে ছুটিতাম সকালে উঠি,
শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল,
করবী থোলো থোলো রয়েছে ফুটি।
প্রাচীর বেয়ে বেয়ে সবুজে ফেলে ছেয়ে
বেগুনী ফুলে ভরা লতিকা দুটি।
ফাটলে দিয়ে আঁখি আড়ালে বসে থাকি
আঁচল পদতলে পড়েছে লুটি।

মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।
এধারে পুরাতন শ্যামল তাল বন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঘেঁসে।
বাঁধের জলরেখা অলসে যায় দেখা,

চলেছে পথখানি কোথায় নাহি জানি,
কে জানে কত শত নূতন দেশে।"

এই গেল পল্লীর মাধুরী—বনদেবতার অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য—সর্ব্ববাধাহীন পরিপূর্ণতার চিত্র—অনাবদ্ধ প্রকৃতির স্বাধীন বিকাশ। এখানে তরুলতা জীবজন্তু সকলেরই নিজস্ব প্রস্ফুটিত হইতে পায়—কেহ কাহাকে চাপিয়া রাখে না। এই স্বাধীনতার জগতে, এই পূর্ণবিকাশের আবহাওয়ায়, এই সরলতা, স্বাভাবিকতা এবং শান্তিসুখময় গতিবিধির রাজ্যে ভাবুকেরা কৃত্রিম সভ্যতার আওতা হইতে পলাইয়া আসিবার জন্য ব্যগ্র। ইহা কি কম বিপ্লব?

আজকাল কল-কারখানা এবং Factory Systemএর অত্যধিক দৌরাত্ম্যে পাশ্চাত্য জগতে সত্যসত্যই প্রকৃতি-পূজা আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহারা "Back to the country", "Back to the land"—এই সুর ধরিয়াছেন। ভারতবর্ষের সভ্যতাও কিছুদিন পাশ্চাত্যের প্রভাবে বিপর্য্যস্ত হইতেছিল—এখন 'প্রকৃতিস্থ' হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এইজন্য এখন "পল্লীসেবক" এ দেশে দেখা দিয়াছেন—"গুরুকুল"ও "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম" প্রতিষ্ঠিত হইতেছে—স্বাভাবিকী "জাতীয় শিক্ষা"র প্রতি জনগণের দৃষ্টি পড়িতেছে।

মামুলি সমাজ, সংসার, সহর, সভ্যতাকে তিরস্কার করিয়া নূতন এইরূপ এক জগতে আশ্রয় লইবার প্রয়াসকেই আমরা এক হিসাবে বিপ্লব-সাধন বলিতে পারি। বিলাতী কবি

"If such be Nature's holy plan
Have I not reason to lament
What man has made of man?"

—মানুষের নিকট সুখ নাই—মানুষই মানুষের শত্রু! "পৃথিবীতে কেহ ভাল ত বাসে না—এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না।" সুতরাং অন্য জগতে চল। বারণ্‌স্‌, স্কট, হার্ডারের ন্যায় অতীতের কথা প্রচার কর, দরিদ্রের কাহিনী—মফঃস্বলের বাণী,—নিম্নজাতির আকাঙ্ক্ষা প্রচার কর, এবং প্রকৃতির ক্রোড়ে আশ্রয় লও। অথবা স্যার টমাস মোরের ন্যায় কল্পনার দ্বারা একটা ইউটোপিয়া-রাজ্য গড়িয়া তোল—কিম্বা রাধার ন্যায় "শ্যাম, শ্যাম, শ্যাম, শ্যাম, শ্যাম নাম জপই ছার তনু করব বিনাশ" এইরূপে কৃষ্ণময় জগৎ ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর। পূর্ব্বে বলিয়াছি ইহারই নাম বিপ্লব। যেখানে মৃত্যুর কথা উঠে না সেখানে চরম কথা নাই।

প্রকৃতি-পূজায় এবং পল্লীসেবায় বিপ্লব-বাদী রবীন্দ্রনাথও বঙ্গীয় চিন্তাজগতে এই চরম তত্ত্ব আনিয়া দিয়াছেন :—

"হায়রে রাজধানী পাষাণ কায়া!
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ় বলে,
ব্যাকুল বালিকারে নাহিক মায়া!
কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথঘাট,

কে যেন চারিদিকে দাঁড়িয়া আছে
খুলিতে নারি মন, শুনিবে পাছে
হেথায় বৃথা কাঁদা দেয়ালে পেয়ে বাধা
কাঁদন ফিরে আসে আপন কাছে।

* * *

সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা
কেমন ক'রে কাটে সারাটা বেলা!
ইঁটের পরে ইঁট, মাঝে মানুষ কীট,
নাই ক ভালবাসা নাই ক খেলা।
দেবে না ভালবাসা, দেবে না আলো
সদাই মনে হয় আঁধার ছায়াময়
দীঘির সেই জল শীতল কালো
তাহারই কোলে গিয়ে মরণ ভাল!"

সামান্য একটা গার্হস্থ্য-চিত্রকে প্রকৃতি-পূজক ভাবুক এক অতি গভীর চিত্তবৃত্তির মনোরম আলেখ্যে পরিণত করিয়াছেন। বন্ধন হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, কৃত্রিমতার কারাগার হইতে সরস জীবনবন্যার উন্মুক্ত উৎসের সমীপবর্ত্তী হইবার বাসনা, অনৈসর্গিক জীবন-যাপন অপেক্ষা মরণকেও শ্রেয়জ্ঞান করিবার প্রবৃত্তি, চিন্তারাজ্যের সেরা extremism বা চরমপন্থিতা সমগ্র কবিতাটিকে স্বাধীনতার করুণ ক্রন্দনে পরিণত করিয়াছে। প্রকৃতিপূজা ও পল্লীসেবা উপলক্ষে প্রতিভাবান্ কবি এই উপায়েই চিন্তাজগতে বিপ্লব সাধন করেন। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকৃতি-

বিষয়ক কবিতারাশির সঙ্গে তুলনা কর—এরূপ স্বাধীনতার গান এরূপ স্বাভাবিকতার উচ্ছ্বাস, প্রকৃতিদেবীর এরূপ মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন এমন রচনাচাতুর্য্যের সহিত, এমন ভাবসমাবেশের সহিত, এমন শব্দপারিপাট্যের সহিত আর কোন কাব্যে পাইবে না।

কার্য্যকরী ভাবুকতা

তন্ময়তা হইতে আরম্ভ করিয়া বিপ্লব, প্রকৃতি-পূজা, পল্লীসেবা পর্য্যন্ত ভাবুকতার নানা অভিব্যক্তি আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কতদূর পারিয়াছি জানি না। এখন ভাবুকতার আর দুই একটা কথা বলিয়া বিষয়টা স্পষ্ট করিতেছি। একজন আধুনিক লেখকের রচনা হইতে ভাবুকতার বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম। তিনি এখন আমাদের দেশে ভাবুকতার বন্যা চাহিতে-ছেন—কিন্তু কিরূপ ভাবুকতা? তাঁহার কথায় সেই ভাবুকতার পরিচয় দিব। রবীন্দ্র-কাব্যের কোন কোন অংশ বুঝিতেও তাহার দ্বারা কথঞ্চিৎ সহায়তা হইতে পারে।

"যে ভাবুকতায় লোকে ভবিষ্যতের মহতী সিদ্ধি ধ্যান করিয়া বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র স্বার্থগুলি ত্যাগ করিতে পারে, সামান্য আরম্ভের মধ্যে অন্তর্নিহিত সমগ্রতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাতেই সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করিতে উৎসাহিত হয়; যে ভাবুকতার অনুপ্রাণনায় বিদ্যাবান্ ব্যক্তি নিজের গৌরব-বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা-লাভ উপেক্ষা করিয়া সমাজের সকলস্তরে বিদ্যাপ্রচারেই আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন,—স্বকীয় উচ্চতর শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা খর্ব্ব করিয়া দশের জন্য শিক্ষালাভের সুবিধা-সৃষ্টির নিমিত্ত

উন্নীত করিবার জন্য সচেষ্ট হন, এবং ধন-ভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখিয়া জলদান, অন্নদান, ঔষধদান ও বিদ্যাদানের ব্যবস্থা দ্বারা ঐশ্বর্য্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারেন; যে ভাবুকতার প্রভাবে ভগবান্ যাঁহাকে যে শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী করিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন, তিনি সমাজ-সেবায় এবং সকল প্রকার দারিদ্র্য-মোচনে সেই শক্তির সম্পূর্ণ প্রয়োগকেই জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম বিবেচনা করেন—সেইরূপ বৈরাগ্য-প্রসূতি ভাবুকতার বন্যা না আসিলে কোন দিন কোন সমাজে নূতন অবস্থার সংগঠন হয় না। যে ভাবুকতায় চিত্তের উন্মাদনা না হইয়া উৎপ্রেরণা হয়, যাহার ফলে শক্তি বিক্ষিপ্ত না হইয়া সংহত ও সংক্ষিপ্ত হয়, যাহার বশে সমাজ ও সংসারের উন্নতি বিধানের জন্য মানব স্থির-সংযতভাবে গৃহত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, আমাদের এখন সেইরূপ ভাবুকতাময় বৈরাগী ও সন্ন্যাসীর প্রয়োজন হইয়াছে।"

"মিষ্টিসিজম্" বা অধ্যাত্মবাদ

আমরা যাহাকে ভাবুকতা বা চরমপন্থিতা বলিলাম, ইংরাজিতে তাহাকে এক্‌স্ট্রীমিজম্, Idealism বা Romanticism বলিতে পারি। উপরের আলোচনায় বুঝা গিয়াছে যে, মাথায় কতকগুলি উচ্চ ভাব, ধারণা বা চিন্তা গিজ গিজ করিলেই কোন ব্যক্তিকে ভাবুক বলা যায় না, তাহার ভাবুকতা আছে স্বীকার করিতে পারি না। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই ভাবুক বলা হয় না—চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থ রচনাকেই ভাবুকতার নিদর্শন বা সৃষ্টি বলিতে পারা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্, এস্, সি, পি, এইচ্, ডি, উপাধি লইয়া বাহির হইলেই, এবং ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা পাণ্ডিত্য দেখাইতে পারিলেই ভাবুক হওয়া যায় না! ভাবুকতা বা Idealism-এর বিশেষ অর্থ আছে। সেই পারিভাষিক অর্থ রবীন্দ্রনাথের কাব্য বুঝিতে গিয়া বোধ হয় কথঞ্চিৎ স্পষ্ট হইয়াছে।

এই ভাবুকতা বা Idealism যখন ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করে তখন তাহাকে আমরা ইংরাজীতে Transcendentalism (অতীন্দ্রিয়তা, অসীমবাদ, অনন্তবোধ) অথবা Super-naturalism, Super-materialism (অতি-প্রাকৃত এবং অতি-মানবীয় ভাব, অর্থাৎ

[illegible]) অথবা Mysticism (পরমাত্মতত্ত্ব, সূফী-বা-

ভাবের অতীত অবস্থা) বলিয়া থাকি। আইডিয়েলিজম, মিষ্টিসিজম্, ভাবুকতা, রোমাণ্টিসিজম্ ইত্যাদির অর্থ উন্মাদ, চ্যাংড়ামি, বাস্তবশূন্যতা, যৌবনের মত্ততা, দুর্ব্বলতা, চরিত্রহীনতা, আবলতাবল বকা, বুজরুকি বা অস্পষ্টতা বা হেঁয়ালি বা ক্ষমতার অভাব নয়।

যে ব্যক্তি জীবনের প্রতিকার্য্যে প্রতিদিনকার প্রত্যেক ওঠাবসায়, চলাফেরায়, আচার-ব্যবহারে transcendentalist অর্থাৎ মিষ্টিক্, তাঁহাকে আমরা—হিন্দুরা—যোগী, ঋষি, মহাপুরুষ ধর্ম্মাত্মা ইত্যাদি জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকি। হিন্দুর আধ্যাত্মিক সাহিত্যে, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারে এইরূপ ব্যক্তিত্ব এবং জীবনযাপন ঋষি-জনোচিত, দেবোপম ইত্যাদি গণনা করা হয়। আমাদের পূর্ব্বাপর সকল মহাপুরুষই এইরূপ ভাবুক, মিষ্টিক্, transcendentalist-পদবাচ্য।

ইহজগতের বাহিরে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সংসারের অতিরিক্ত আর একটা জগৎ আছে। সে জগতের তত্ত্ব আমরা কিছুই জানি না— জানিবার উপায় আছে কি না তাহাও জানি না। সেই জগতের ভাবসমষ্টি জীবনে উপলব্ধি করা, তাহার তত্ত্ব প্রচার করা, তাহার দ্বারা এই নশ্বর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দময় সংসারকে অরূপ, অসীম, ভূমান্, বিভূতিমানের সংস্পর্শে আনিয়া খানিকটা উন্নত, উদার ও মহান্ করা—এই সকল কার্য্যকেই আমরা ঋষি, মহা-

এখানে বলিয়া রাখি—ইউরোপের গুরু যীশু, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক হিসাবে হিন্দুর সন্তান। কিন্তু ইউরোপের জল-হাওয়ায় যীশুর "অধ্যাত্মবাদ" হজম হয় নাই। উহাদের সমাজে যীশুর হিন্দু-বাণী বসে নাই। খৃষ্টসমাজ জীবন-সংগ্রাম-টাই প্রাণে প্রাণে স্বীকার করে—যীশু-তত্ত্ব মুখে আওড়ায় মাত্র, কিছুকাল হইতে আওড়ানও বিদায় দিয়াছে! অথচ এই আদর্শ ও চিন্তা সাধারণ হিন্দুর মজ্জায় প্রবিষ্ট।

অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত ভারতবাসী আজ ৫০০০ বৎসরের শিক্ষার ফলে, অভ্যাসের ফলে, ক্রমবিকাশের ফলে, এবং সংস্কারের ফলে এই অধ্যাত্মবাদের,—এই transcendentalism, এই মিষ্টিসিজম, এই idealism এর উত্তরাধিকারী হইয়া জগতের গুরুরূপে বিরাজ করিতেছে। মিষ্টিসিজম্ ভারতের খাঁটি স্বদেশী জিনিষ—ইহার জন্যই আমাদের গৌরব। ইউরোপ এ অমৃত পাইলে মুক্ত হইবে। ভারতবাসী, তুমিই তাহার মুক্তির উপায় স্বরূপ হইতে পারিবে—জানিয়া রাখ।

জীবনে এই অত্যুচ্চ আদর্শ উপলব্ধি করা কথার কথা মাত্র নয়। এই অসীম অতীন্দ্রিয় ভূমানন্দকে কর্ম্মের দ্বারা বুঝা এবং বুঝান, অনুষ্ঠানের দ্বারা বিশ্বাস করা এবং বিশ্বাস করান, মনুষ্যত্বের দ্বারা অর্জ্জন করা এবং প্রচারিত করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। তথাপি

সময় আমরা এই সমুদয় শিল্প-ও সাহিত্যকে transcendental, আধ্যাত্মিক, ভাবুকতাময় ইত্যাদি আখ্যা দিয়া থাকি। তাঁহাদের চরিত্র, মনুষ্যত্ব, ব্যক্তিত্ব, দৈনিক কার্য্যকলাপ যেরূপই হউক না, তাঁহাদিগের কারিগরি সম্বন্ধে বলিব যে, তাঁহারা চিত্রের দ্বারা, সাহিত্যের দ্বারা শিল্পের দ্বারা আধ্যাত্মিকতা, অতীন্দ্রিয়তা, অ-সাংসারিকতা, অনন্তে প্রবৃত্তি, অসীমে বিশ্বাস ইত্যাদির পুষ্টি সাধন করিতেছেন। এই সকল গুণী,শিল্পী বা কবি ব্যক্তিকে আমরা transcendentalist, মিষ্টিক্ ইত্যাদি বলিতে আপত্তি করি না।

অমুক কবি বা শিল্পী 'মিষ্টিক'— এ কথা বলিলে বুঝিব,— তাঁহার কাব্যে বা শিল্পে অধ্যাত্ম-জগতের আলোচনা আছে। সেই ব্যক্তির জীবন ঋষি-জনোচিত কি না তাহা বুঝিতে পারিব না। ভারতবর্ষের প্রায় সকল সাহিত্যসেবী চরিত্র-হিসাবে না হইলেও অন্ততঃ এই হিসাবে স্বভাবতই মিষ্টিক। আমাদের উপনিষৎ মিষ্টিক্ সাহিত্য, আমাদের গীতা মিষ্টিক্ সাহিত্য, আমাদের অভঙ্গ ও কীর্ত্তন মিষ্টিক্ সাহিত্য, আমাদের পদাবলী মিষ্টিক্ সাহিত্য, আমাদের রামপ্রসাদী গীত মিষ্টিক্ সাহিত্য, "রামকৃষ্ণ-কথামৃত" মিষ্টিক সাহিত্য, হরনাথের "উপদেশামৃত" মিষ্টিক সাহিত্য।

আমাদের আধুনিক কবিবরও শিল্প-জগতের একজন মিষ্টিক্। তিনি ভারতবর্ষের সনাতনী ধারাই সাহিত্য-জগতে, চিন্তার ক্ষেত্রে,

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না।
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে তোমারে দেখিতে দেয় না।"

—ইহার নাম Mysticism বা ভগবদ্ভক্তি—রাধার প্রেম—মুমুক্ষুর আকুল ক্রন্দন, অসীমে প্রীতি, অনন্তবোধ—ধরা ছোঁয়া যায় না যাহা তাহা পাইবার অভিলাষ—হিন্দুর "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।" মুক্তির জন্য, জগদম্বার কৃপালাভের জন্য সসীম মানবের, বদ্ধজীবের, দুর্ব্বলচিত্তের এইরূপেই কাঁদিতে হয়। "হরি, বেলা হ'ল দিন ত গেল পার কর আমারে"—রবীন্দ্র-কাব্যে এই সরল সহজ হিন্দুত্বই, এই করুণাভিক্ষাই সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবে।

সাধক তাঁহার ষট্‌চক্রভেদের অর্দ্ধপথে বলিবেন:—"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই।" স্বদেশসেবক সংশয় ও বিশ্বাসের মধ্যে দোদুল্যমান হইয়া অনেক সময়ে এইরূপই ভাবিয়া থাকেন:—"কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে।" দুর্ব্বলতা কর্ম্মবীরকে বহুকাল আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে—তখন তাহাকে করুণ স্বরে বলিতেই হয়—

"কি করিলে বল পাইব তোমারে, রাখিব আঁখিতে আঁখিতে,
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ তোমারে হৃদয়ে রাখিতে।"

পুণ্যকর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিতে অভ্যস্ত হইতে থাক—দেখিবে আদর্শকে, জীবনের ধ্রুবতারাকে লাভ করিবার পূর্ব্বে তোমার কত ঘাঁটি, কত স্তর পার হইতে হয়। দুর্ব্বলতা,

পণ্ড করিতে থাকে। মানবের ক্ষমতার সীমা আছে। সসীম শক্তির সাহায্যে অসীমকে পাইতে হইলে, এরূপ হোঁচোট খাইতে খাইতেই চলিতে হইবে। মানব-জীবনের ইহা স্বাভাবিক কথা।

আর একটি মিষ্টিসিজমের চিত্র দিতেছি। তুমি হয়ত তোমার লক্ষ্যকে আন্তরিক ভাবে ধরিতে পার নাই—তোমার ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য তুমি যথেষ্ট আয়োজন কর নাই; তুমি অল্পমাত্র চরিত্র-সম্বল এবং বিশ্বাস ও দৃঢ়তা লইয়া, ভবিষ্যতের সকল প্রকার সুযোগসুবিধা এবং বাধা-বিঘ্নের কথা না ভাবিয়া কাজে নামিয়াছ। এই অবস্থায় তুমি জগতের শক্তিগুলি ব্যবহার করিতে পারিবে না—তোমার সন্দিগ্ধচিত্ততা, তোমার অক্ষমতা, তোমার অবিশ্বাস তোমাকে কার্য্যকালে পঙ্গু করিয়া রাখিবে। ইহা ত স্বাভাবিক, তাই—

"কোথায় আলো কোথায় মাল্য, কোথায় আয়োজন!
রাজা আমার দেশে এল কোথায় সিংহাসন!
হায়রে ভাগ্য, হায়রে লজ্জা, কোথায় সভা কোথায় সজ্জা!
দু'এক জনে কহে কানে—বৃথা এ ক্রন্দন—
রিক্ত করে শূন্য ঘরে কর অভ্যর্থন।"

তোমার সম্মুখে—পায়ের উপর দিয়া গঙ্গা বহিয়া গেল—হায় তুমি তাহা হইতে এক গণ্ডূষও জল তুলিয়া লইতে পারিলে না!

ভাগ্যবান্ সে, যে পূর্ব্ব হইতে চরিত্র গঠন করিয়া রাখিয়াছে—

"শুভক্ষণ" উপস্থিত হইবার যথোচিত পূর্ব্বেই বুঝিতে পারে—

"ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সম্মুখ পথে,
আজি এ প্রভাতে গৃহ কাজ লয়ে রহিব বল কি মতে ?
বলে' দে আমায় কি করিব সাজ
কি ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে কোন্ বরণের বাস ?"

খৃষ্টান সাহিত্যে "বর" দেখিবার জন্য এইরূপেই প্রস্তুত থাকিবার কথা আছে। আমাদের অদ্বৈত নিত্যানন্দও এইরূপেই মহাপ্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের হিন্দুত্ব

কবি রবীন্দ্রনাথকে একটা সাম্প্রদায়িক দলের নেতা করিয়া তোমরা বড়াই করিয়াছ—অথবা কবি রবীন্দ্রনাথকে তোমরা একটা সম্প্রদায়-বিশেষের কবি মনে করিয়া তাঁহার সঙ্গে লড়াই করিয়াছ। এজন্য কবি রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে গোল বাঁধিয়াছে। রক্ত-মাংসের মানুষ রবীন্দ্রনাথ—সুপুরুষ, সুরসিক সুগায়ক রবীন্দ্রনাথ, শিলাইদহের রাইয়ত-শাসক, বোলপুরের "ইস্কুল-মাষ্টার" রবীন্দ্রনাথ—কোন লোকের প্রীতির কারণ হইয়া থাকিতে পারেন, কোন লোকের বিরাগভাজন হইয়া থাকিতে পারেন। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ কোন সমাজবিশেষের কর্ত্তা থাকিতে পারেন—কোন অনুষ্ঠান-বিশেষের প্রবর্ত্তক থাকিতে পারেন—কোন প্রতিষ্ঠান-বিশেষের ধুরন্ধর থাকিতে পারেন;—ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য স্থলে অসংখ্য মত পরিবর্ত্তন, চরিত্রে পরিবর্ত্তন, কর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিতে পারেন, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন পরস্পরবিরোধী কার্য্যপ্রণালী প্রচার বা অনুসরণ করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে যাইয়া সেগুলির দিকে তাকাইও না। অথবা যদি কোন সংবাদ লও, তাহার দ্বারা কাব্যকে বুঝিতে চেষ্টা কর। সেই ব্যক্তিত্ব তোমার ভাল লাগে কি মন্দ লাগে বলিয়া কবিতারাশিকে ভাল কি মন্দ বলিও না। কবি রবীন্দ্রনাথ কোন দলেরই নেতা নহেন—কবি

রবীন্দ্রনাথ কোন সম্প্রদায়েরই পৃষ্ঠপোষক নহেন—তিনি হিন্দু কবি,—অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় মর্ম্মকথার প্রচারক।

ভারতবর্ষকে তোমরা কোন একটা সম্প্রদায় বা গণ্ডী বা দল বা মতবাদে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। হিন্দু সম্বন্ধেও তাহাই,—হিন্দুত্বকে বাঁধাবাঁধির মধ্যে রাখিতে পারিবে না। ভারতবর্ষ সর্ব্বগ্রাসী, হিন্দুত্ব সর্ব্বগ্রাসী। ভারতবর্ষ যুগে যুগে দেশে দেশে যাহা দিয়াছে তাহাকেই আমরা হিন্দুত্ব বলিয়া থাকি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই ভারতবর্ষের দান—তিনি আমাদের সেই ক্রম-বিকশিত চিরপ্রকাশমান হিন্দু।

বাজে আবরণগুলি লইয়া তর্ক করিও না—তোমার আমার দলাদলিগুলি ভুলিয়া যাও। হিন্দু-ব্রাহ্মের দুদিনকার খেলাধূলাগুলি "সকল ফেলে মায়ের কোলে ছুটে" এস—বঙ্গভারতীর একটি শ্রেষ্ঠ সন্তানের বাণী শুনিতে থাক। তাঁহার চেহারা ভুলিয়া যাও—তাঁহার ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া যাও, তাঁহাকে তুমি চেন সে কথা মনে রাখিও না। সেই বাণীর মধ্যে, সেই কাব্যের মধ্যে, সেই চিন্তার মধ্যে তুমি ভারতবাসী বিংশশতাব্দীতে যাহা চাও সকলই পাইবে—বলিতেছি, সকলই পাইবে—সমগ্র ভারতবর্ষকে পাইবে—হিন্দুত্বকে পাইবে—যোগ, ধ্যান, মূর্ত্তিপূজা, জাতিভেদ সবই পাইবে—বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র হইতে বন্দা বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত সকল রত্নই পাইবে। এই ভাবপুঞ্জের মহাসাগরে ঝাঁপ দাও—চিত্ত-কলেবর ধৌত স্নাত শুদ্ধ হইবে—স্বাস্থ্য অর্জ্জন করিতে পারিবে—

মণ্ডল হইতে নিঃশ্বাস গ্রহণ কর—অন্তঃকরণ পূত পবিত্র স্নিগ্ধ হইবে। তোমরা বেদান্ত-উপনিষদ্-গীতা-বাল্মীকি-তুকারাম-কবীর-রামদাসের নাম মাত্র শুনিয়াছ। হায় শিক্ষিত বাঙ্গালী, তোমরা এ সকল অমূল্য গ্রন্থ চোখে দেখ নাই—দেখিলে সংস্কৃত বুঝিবে না, হিন্দী বুঝিবে না, মারাঠী বুঝিবে না! না বুঝ ক্ষতি নাই—আমাদের বাঙ্গালীর 'রামকৃষ্ণ-কথামৃত' আছে, হরনাথের 'উপদেশামৃত' আছে, প্রসাদী সঙ্গীত আছে—বৈষ্ণবপদাবলী আছে। আর আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ আছেন। ভাবুক রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্য আলোচনা কর—এই বিংশশতাব্দীর 'অভঙ্গ'-'কীর্ত্তন'-'মাল্‌সী'কে—বাঙ্গালীর এই "গ্রন্থ সাহেব"কে জীবনের উপদেষ্টা কর—প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিবে;—বিংশ-শতাব্দীর জন্য তোমার যে গুরু কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তাহা পালন করিবার উপযোগী মানুষ হইতে পারিবে।

এত কথা বলিলাম। কারণ আছে। আমাদের বিশ্বাস—রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, তাহার ফলে আর যাহাই হউক—তাঁহাকে একটা নূতন সঙ্কীর্ণ সমাজের ছোট-খাট দলভুক্ত একজনরূপে বাড়িয়া উঠিতে হইয়াছে। বিশাল হিন্দু-সমাজের মধ্যে তাঁহার জন্ম-নিকেতন, তাঁহার আবেষ্টন অনেকটা বিচ্ছিন্ন সমুদ্র-দ্বীপের ন্যায় লোক-হৃদয়ে বিস্ময়মাত্র সৃষ্টি করিত। হিন্দুসমাজ তাঁহাকে এই কারণে তাহার নিজেরই একজন ভাবিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাঁহার সকল কথাকেই বিদেশী মাল,

বলিয়া জনসাধারণ সন্দেহ করিয়াছে। এজন্য তাঁহার মিষ্টিসিজম্‌কে কেহ বা দুর্ব্বোধ্য অলীকতা, কেহ বা অহিন্দু "নূতন কিছু" ভাবিতেন। আমরা বলিব—এইরূপ বিবেচনা করা হিন্দুসমাজের আত্মরক্ষার প্রয়াসমাত্র—এই দ্বন্দ্ব অতি স্বাভাবিক। যাঁহার সঙ্গে সমাজগত কোন যোগ নাই, বরং রীতিনীতি-বিষয়ক কিছু কিছু বিচ্ছেদই আছে, তাঁহার কথা পূর্ণ অন্তঃকরণে, কে বিশ্বাস করিতে পারে?

পাঠকগণ, আমরা হিন্দু—ব্রাহ্মভাবে রবি বাবুকে আমাদের একজন আচার্য্য কখনও মনে করি নাই। হিন্দুভাবে তাঁহার কাব্যশিল্পের পরিচয় লইয়াছি। আমাদের জ্ঞানে কবি-রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় জনসাধারণের হৃদয়, আকাঙ্ক্ষা, চিত্ত ও বুদ্ধি হইতে চুল মাত্র দূরে দাঁড়াইয়া নাই।

আমরা হিন্দুয়ানীর সেবক—আমরা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রচারক। আমরা বলি—হিন্দুসমাজ বর্ণাশ্রমের জন্যই বাঁচিয়া আছে, উন্নতও হইয়াছে। ইহারই ফলে বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর, ব্রাহ্ম সকল সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সম্প্রদায়গুলি নিঃশব্দে নিজ নিজ দাতব্য দান করিয়া বিরাট হিন্দু-সমাজকে যুগে যুগে প্রদেশে প্রদেশে বিস্তৃততর ও দৃঢ়তর করিয়া তাহারই মজ্জায় মজ্জায় পরদায় পরদায় মিশিয়া রহিয়াছে।

আমাদের ধর্ম্ম-জীবনে ইউরোপের Crusades নাই, Inquisition নাই, Wars of Reformation নাই, Peace

ধর্ম্ম-পার্থক্যে রক্তারক্তি নাই। আমাদের বর্ণাশ্রমে সাদা ও কাল লোকের জন্য স্বতন্ত্র গাড়ী, স্বতন্ত্র জাহাজ, স্বতন্ত্র কায়দার উদ্ভব হয় নাই। আমাদের বর্ণাশ্রমের প্রভাবে একে একে সমগ্র হিন্দুস্থানে প্রকৃত সার্ব্বজনীন শিক্ষা (Universal Education), নিম্ন জাতির ক্রমিক উত্তোলন, জাতীয়চরিত্র-গঠন, এবং স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমাদের সমাজে Suffragette আন্দোলন নাই। আমাদের বর্ণাশ্রমের নিয়মে বড় চাকুরে এবং ছোট চাকুরে প্রভেদ নাই, মাহিয়ানার অনুপাতে বিবাহ ও জ্ঞাতি-ভোজন হয় না। আমাদের বিধানে অদূরদর্শী socialism এবং বা সমাজতন্ত্রবাদের আবশ্যক হইত না ; strikes, labour-union, ধর্ম্মঘট, কুলীবিভ্রাট ঘটিত না।

আমরা বুঝি—জাতিভেদই যথার্থ ঐক্যবোধে প্রতিষ্ঠিত—আমাদের স্থির-উন্নতির চিরসহায়। আমরা যুগে যুগে জাতিভেদের বিকাশ সাধন করিয়াছি, এখনও উন্নত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র সৃষ্টির সূত্রপাত করিতেছি। জাতিভেদের বিনাশ সাধন করিলে আমরা জগতে থাকিব না, পৃথিবী দরিদ্র হইবে। ইহাকে লইয়া ইহারই সাহায্যে আমরা উন্নত হইতেছি। সময় আসিতেছে—যখন আমরা পাশ্চাত্য সমাজ-বন্ধনের ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, অসম্পূর্ণতা, দুর্ব্বলতা এবং ভঙ্গুরতা প্রমাণ করিতে পারিব। আমরা আমাদের হিন্দুয়ানী স্বীকার করিতেছি। আমরা সাধক রামকৃষ্ণের ভক্ত, পাগল হরনাথের শিষ্য।

দান বুঝিতেছি। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ ইঁহারা যে হিসাবে হিন্দু, রবীন্দ্রনাথ সেই হিসাবে হিন্দু। তাঁহারা বৈষ্ণব, কি শৈব, কি তান্ত্রিক—এ তথ্য জানিয়া আমরা বিচলিত হই না। রবীন্দ্রনাথও ব্রাহ্ম এ তথ্য জানিয়া বিচলিত হইব কেন ? রবীন্দ্রনাথ হইতে যখন তুমি কাল-হিসাবে দূরে সরিয়া যাইবে তখন ত বিচলিত হইবার কারণ থাকিবে না। ইউরোপ আজ স্থানহিসাবে বহুদূরে। এজন্য তাঁহারা ভারতবাসীর বৌদ্ধ, সৌর, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম এ পার্থক্য বুঝেন নাই। তাঁহারা রবীন্দ্র-কাব্যে ভারত-আত্মার বাণী শুনিয়াছেন। এজন্যই তাঁহাদের সমাজে যুগান্তরের পূর্ব্বলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি।

পাশ্চাত্য জগৎ রবীন্দ্রনাথকে হিন্দুস্থানের বাণী-মুর্ত্তিরূপে বুঝিয়াছে। হিন্দুস্থানের নর-নারীগণ, তোমরাও সাময়িক এবং স্থূল ও ক্ষুদ্র সীমাগুলি অতিক্রম করিয়া ইঁহাকে তোমাদের স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্ত্তিরূপে গ্রহণ কর।

৭৫-পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ সোনার ভারতের কণামাত্র দান করিয়াছেন। সেই কণিকার আস্বাদেই খৃষ্টান আজ হিন্দুকবির চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়াছে, ইউরোপ দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছে। তাহারা এক নূতন জগৎ দেখিল, এ জন্যই এত বিভোর, এত আত্মহারা।

ভারতবাসী, তোমার বিংশশতাব্দীর শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-

দেখিতেছি। ভারতবর্ষ, একজন উদীয়মান কবির কথায় বলিলাম—

"তোমারি চরণ তলে রহিয়াছে পড়ি
দৈন্যনাশী ধরণীর সমগ্র রতন।"

বিশ্বচিন্তায় ভাবুকতা

আমরা বলিলাম—ইউরোপ এক নূতন জগৎ দেখিল।

গ্রীকসাহিত্যে হিন্দুর এই বিচিত্র ভাবুকতা পাইবে না। ঈস্কীলাস, সফোক্লীস, ইউরিপিডিস, য়্যারিষ্টফেনিসের রচনায় ভাবুকতা আছে—তাহা ঐ ধরণের ভাবুকতা নহে। তাঁহারা অদৃশ্যজগতের, অনাদ্যন্তের, অসীমের, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ধার ধারেন না। তাঁহাদের দৌড় Fate, Nemesis, দৈব পর্য্যন্ত। হোমার হইতে য়্যারিষ্টটল পর্য্যন্ত সেই এক কথা—ইহজগতের যাহা কিছু তাহাই চরম—গ্রীকেরা "ততঃ কিং" জানিত না।

প্লেটো হিন্দু ভাবুকতার আভাস পাইতেছিলেন। তাহার শেষ স্তর হিন্দু যীশুর অধ্যাত্মবাদে—"My Kingdom is not of this world." যীশুর নূতন জগৎ-কথা আর আমাদের মিষ্টিসিজম্ অভিন্ন। কিন্তু আগেই বলিয়াছি—ইউরোপের মানুষ, খৃষ্টানসমাজ যীশুতত্ত্বকে জীবনের কাজে উপলব্ধি করিতে পারে নাই—তাহারা যীশুকে বাদ দিয়া খৃষ্টান!

রোমের কথা ছাড়িয়া দাও—তাহারা সাহিত্য-কলা-দর্শনের ধার ধারিত না। তাহারা লড়াই করিয়াছিল—যুদ্ধ জিতিয়াছিল—লোক শাসন করিয়াছিল। ইহাদের নিকট আইন শিক্ষা করিও।

অনেক নূতন নূতন আশা পাইবে—চিন্তার রোমাণ্টিসিজম্ বা চরমপন্থিতা পাইবে, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলের আলোচনা পাইবে—সর্ব্বত্র মহান্ বৃহৎ উচ্চভাবের পরিচয় পাইবে—ভাবুকতার বহু চিহ্ন দেখিতে পাইবে—কিন্তু হিন্দুর অনন্তবোধ পাইবে না—"তদাত্মানং সৃজাম্যহং" পাইবে না।

চসারের ভাবুকতায় সমাজের প্রতি বিদ্রূপ পাইবে—বেশ গাল ভরিয়া হাসিতে পারিবে—কিছু উপকারও হইবে—কিন্তু ক্ষুধা মিটিবে না—পেট ভরিবে না।

সেক্সপীয়র আটলাণ্টিক মহাসাগর—কূল-কিনারা পাওয়া কঠিন—সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ ওখানে আছে—সেক্সপীয়রে ইউরোপের 'বিশ্বরূপ' দেখ। তাঁহার ভিতর এক নূতন রকমের ভাবুকতা আছে—সকলের পক্ষে বুঝা কঠিন। তাঁহার বেদনা-মূলক বিষাদাত্মক tragedyগুলি একবার দুইবার তিনবার দশবার পড়—নানা অবস্থায় নানা মনোভাবের সঙ্গে রোমীয়ো-হ্যাম্‌লেট-সীজার-লীয়ার-ওথেলোর সঙ্গে আলাপ কর, ভিন্ন ভিন্ন বয়সে এই-গুলির সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাও। পরে দেখিবে—ষোড়শ শতাব্দীর পাশ্চাত্য কবিবরের ভাবুকতা কি প্রকার। অনন্ত প্রেম, অনন্ত-জ্ঞান, অনন্ত কর্ম্ম, অসীম বাসনারাশি, উদাস জীবন, চাঁদ ধরিবার প্রবৃত্তি, ধরাকে সরা-জ্ঞান, নূতন জগৎ জয় করিবার জন্য আলেক্-জাণ্ডারের ন্যায় ক্রন্দন,—সর্ব্বতোমুখিনী অতৃপ্তি—Divine discontent—এই সবের চূড়ান্ত পাইবে। কিন্তু রসিক-

প্রকাণ্ড বিরোধ রহিয়াছে। দেখিবে প্রকৃতি, জগৎ, সমাজ, সংসার, রাষ্ট্র, পরিবার—এই সকল সত্যকার ঘটনা—প্রকৃত মানব-জীবনের এই আবেষ্টন (environment) বা বিশ্বশক্তি মানুষের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ-উদ্যমকে ব্যর্থ করিতেছে, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন আকার দিতেছে। সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবে, প্রথম অবস্থায়—

"প্রভাত কিরণে সকাল বেলাতে,
মন লয়ে সখি গেছিনু খেলাতে,
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে,
মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,

* * *

আমার কুসুম কোমল হৃদয় সহেনি কখনও রবির কর,
আমার মনের কামিনী পাঁপড়ি সহেনি ভ্রমর চরণ ভর,
চিরদিন সখি হাসিত খেলিত,
জোছনা আলোকে নয়ন মেলিত ;"

তার পর—বাস্তবের সহিত পরিচয় ও দ্বন্দ্ব, প্রকৃতি হইতে আঘাত প্রাপ্তি, এবং চৈতন্যলাভ, বেদনা, বিষাদ, মত্ততা, মৃত্যু—

"সহসা সজনি চেতনা পেয়ে
সহসা সজনি দেখিনু চেয়ে
রাশি রাশি ভাঙ্গা হৃদয় মাঝারে
হৃদয় আমার হারিয়েছি।"

দেশের মাটির দিকে তাকাও—সমাজের দিকে তাকাও—বাস্তবের দিকে তাকাও—এই জগতের দিকে তাকাও।

সেক্সপীয়র আর বেশী দূর উঠিতে পারেন নাই! তিনি সেই সফোক্লীস ইউরিপিডিসের ষোড়শ শতাব্দীর উত্তরাধিকারী,—খাঁটি গ্রীক সন্তান—এলিজাবেথের যথার্থ প্রজা—য়্যারিষ্টটলের ছাত্র, বেকনের গুরু-ভাই। তাঁহার ভাবুকতায়—"কত চতুরানন মরি মরি যাওত, ন তুয়া আদি অবসান," অথবা "তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম সুতমিত রমণীসমাজে"—এ ধুয়ার ধোঁয়া পর্য্যন্ত পাইবে না।

কবি পোপ সেক্সপীয়রের সহোদর :—

"The proper study of mankind is man!"

গেটের ফৌষ্ট দেখিয়াছি। তিনিও সেক্সপীয়রের আত্মীয়। সেক্সপীয়রের সাহিত্যে প্রকৃতি ও আবেষ্টন যে বস্তু, জার্ম্মাণ-কবিবরের মেফিস্টফিলিসও তাহাই। ইঁহাদের বিবেচনায় ভাবুকতার ফল—বিফলতা, নৈরাশ্য, পাগলামী। তাঁহার চূড়ান্ত কথা—Your America is here or no-where, তোমার স্বর্গ এজগতেই—বাস্। হার্ডার, শিলার, শোপেনহোয়ারের নূতন কাহিনী, নূতন জগৎ-কথা গেটের ভাবুকতায় স্থান পায় নাই।

গ্রীকদিগের Fate, Nemesis, সেক্সপীয়রের বাস্তব আবেষ্টন, জার্ম্মান্ সাহিত্যের Mephistopheles ও পুলিশ প্রহরী এক গোত্রের শক্তি,—মানুষের মুগুর, মানুষকে সর্ব্বদা

করিয়া সংসারে মজাইতেছে। এজন্যই ইউরোপের বিচিত্র ভোগ-প্রধান সভ্যতা। তাহারা প্রকৃত অসীমের সংবাদ রাখেনা।

আধুনিকের মধ্যে ব্রাউনিঙ্গকে আমাদের ঘরের লোক করিয়া লইতে পারি। প্রয়োজন হইলে তাঁহার সঙ্গে আমাদের এক পংক্তিতে ভোজন বেশী কঠিন হইবে না। তাঁহার কাব্যে আত্মার কথা আছে—অধ্যাত্মবাদ বুঝিবার প্রয়াস আছে। যোগী ওয়ার্ডসওয়ার্থ এ সম্বন্ধে বিলাতের গুরু—কিন্তু তাঁহার রচনাবলীর ভিতর এত বাজে মাল আছে যে, তাহা হইতে আমাদের কথা টানিয়া বাহির করা কঠিন—করিয়া লাভও নাই। "With gentle hand touch, for there is a spirit in the woods"—তরলীকৃত হিন্দুত্ব কিছু এখানে পাইবে।

শেলীর হৃদয়ে ভাবুকতা ছিল—তিনি ব্রাউনিঙ্গের জ্ঞাতি—হয় ত অগ্রজ। কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিকতা তাঁহার ভিতর খুঁজিতে যাওয়া বৃথা প্রয়াস।

বোধ হয় মিল্টনের সমগ্র সাহিত্য-জীবনটা একটা অখণ্ড হিন্দু ভাবুকতায় পরিপূর্ণ। পাশ্চাত্য জগতে আর ত কাহাকে এরূপ একটানা ভাবুক, এবং এরূপ হিন্দু ভাবুক পাই না। তিনি ভগবানের শক্তিতে বিশ্বাসবান্—তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন—to justify the ways of God to man। এ চেষ্টা তাঁহার ক্ষুদ্র কাব্যের, মহাকাব্যের, গদ্য-গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। Comus-এ ধর্ম্মের জয় দেখ, পাশ্চাত্য সভ্যতার এবং খৃষ্টান

দেখ—স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কর্ম্ম ও স্বাধীনতার প্রবন্ধাবলী দেখ। আর দেখ Paradise Regained—স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবেই হইবে—পুণ্যের স্রোত কেহ রুধিতে পারিবে না—"যদি পণ করে থাকিস্ তা হ'লে হবেই হবে"—ভগবানের রাজ্যে পাপের প্রশ্রয় নাই। এ কি আমাদের জন্মান্তর-বাদের কথা নয়?—আত্মার খোলস-ত্যাগের কথা নয়? যুগে যুগে জন্ম-জন্মান্তরে মানব-আকাঙ্ক্ষা, তোমার আকাঙ্ক্ষা, আমার আকাঙ্ক্ষা, দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গের আকাঙ্ক্ষা যে একদিন না একদিন পূর্ণ হইবে—এ আশার-কথা, এ ভবিষ্যতে বিশ্বাসের কথা ইউরোপে মিল্টন ছাড়া আর কেহ গভীর ও ব্যাপকভাবে প্রচার করেন নাই। মিল্টন হিন্দু।

বানিয়ানও তাই—কেবল চিন্তায় ও আদর্শে নয়—বোধ হয় জীবনে এবং চরিত্রেও অনেকটা।

একটুকু ফরাসী সাহিত্যে ভাবুকতার পরিচয় দিতেছি। মধ্যযুগের ট্রুভিয়ার ট্রুবেডোরদের প্রেমসঙ্গীত ও বীরগাথার কথা বলিব না। চতুর্দ্দশ লুইয়ের গৌরবযুগও বর্ণনা করিব না, ফরাসী-সাহিত্য-পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা ও কলবার্টের "সংরক্ষণ-নীতি"র পরিচয়ও দিতে চাহি না। সপ্তদশ শতাব্দীর মোলিয়ার, রেসিন প্রভৃতি কবিগণ গ্রীক আদর্শ কিরূপে নূতন প্রচার করিতেছিলেন সে কথাও বলিব না। আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর রুসো-ভল্টেয়ার-Encyclopaedistদিগের বিজ্ঞান-যুগের কথা বলিতেছি।

তাহাতে ভগবদ্‌ভক্তির চিহ্ন পাইবে না, অধ্যাত্ম জগতের সংবাদ পাইবে না। তাহাদের ব্যাকুলতা ছিল, আকুল ক্রন্দন ছিল, অতৃপ্ত বাসনা ছিল; কিন্তু তাহারা বৈরাগ্য বুঝিত না, চাম্‌ড়ার চোখ কাণ ছাড়া তাহাদের আর কোন ইন্দ্রিয় ছিল না। তাহারা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত "she gave me eyes, she gave me ears" বলিতে শিখে নাই। তাহারা অতীন্দ্রিয়কে চিনিতে চেষ্টা করে নাই। তাহারা যীশুকে ইউরোপ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল Reasonকে, স্থূলজ্ঞানকে ভগবানের সিংহাসনে বসাইয়াছিল।

সেক্সপীয়রের ভাবুকতা দেখিয়াছ—তাহাতে মুক্তি, নির্ব্বাণ, বৈরাগ্যের গন্ধমাত্র নাই। সবই এই জগতের লাফালাফি, বাড়াবাড়ি, নাচানাচি। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী ভাবুকতায়ও "আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তির" প্রয়াস পাইবে না। এই ছোট সংসারের খেলা-ধূলা লইয়াই যা কিছু দুরাশা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা,—'প্রাংশু লভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ"—তাহার বিফলতা, নৈরাশ্য এবং বেদনা।

প্রকৃত প্রস্তাবে ফরাসীর সমগ্র জাতীয় জীবনটাই একটা প্রকাণ্ড হ্যামলেট-কাব্য—একটা প্রকাণ্ড সীজার-কাব্য, একটা প্রকাণ্ড সেক্সপীয়রীয় "ট্র্যাজেডি"। ১৭৮৯ হইতে ১৮১৫ সাল পর্য্যন্ত (এমন কি ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত) ইউরোপের মানব-জীবন ফরাসী ভাবুকতার বেদনা-মূলক নাট্যকাব্য। এ মহাকাব্যের কবি এখনও জন্মেন নাই। কিন্তু জীবন কাব্যটাই

এই নাটকের কর্ম্মক্ষেত্র সমগ্র মানব-জগৎ। আগেই বলিয়াছি, ফরাসী জাতি যীশুকে বিদায় দিয়াছে—অতীন্দ্রিয়কে বাদ দিয়াছে। তাহাদের যাহা কিছু এই জগতেরই স্বর্গ, মর্ত্ত্য রসাতলে—ভারত, ইউরোপ ও আমেরিকায় আবদ্ধ। বিধাতা এক লক্ষ শার্লাম্যান, পঞ্চাশ হাজার সীজার, পঁচিশ হাজার আলেক্‌জাণ্ডারের উপাদানে একটি জীব গঠন করিয়াছিলেন। সে ইউরোপের বামন-অবতার বীরবর নেপোলিয়ন। মানব-সংসারের এই বামন মূর্ত্তি ফরাসী রিপাব্লিকের নিকট ত্রিপাদ ভূমি মাগিয়া লইলেন। অমনি এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা—ত্রিভুবনে বিরাট তাণ্ডবের আয়োজন হইল। ইউরোপের মানদণ্ড-স্বরূপ আল্পস্ পর্ব্বতকে স্তম্ভ করিয়া, ফরাসী জাতিটাকে রজ্জু করিয়া, গঙ্গাবক্ষে রাইণবক্ষে এবং মিসিসিপি বক্ষে চরণ রাখিয়া এই বিরাট পুরুষ মানব-সাগর মন্থন করিতে লাগিলেন। জাগতিক অসীমতার, সেক্সপীয়রীয় অনন্ত-বোধের চূড়ান্ত দেখ—মানব নটরাজের নৃত্য দেখ—Pleistocene Epoch হইতে Glacial যুগের উৎপত্তি দেখ—আধুনিক ইউরোপের, শিল্প-বিজ্ঞান-'স্বরাজে'র সৃষ্টি দেখ।

এ অপরূপ দৃশ্য ধ্যান করিতে পারিলে তবে হিন্দু শাস্ত্রীয় সাগর-মন্থনের আবাহন বা আগমনী মাত্র বুঝিতে পারিবে। সাবধান, দুর্ব্বলচিত্তেরা এ দৃশ্য দেখিও না, পাগল হইয়া যাইবে, হতাশ হইয়া পড়িবে! কিন্তু এই বিভীষিকার, এই বিফলতা-নৈরাশ্যের, এই হয়রাণ হওয়ার, এই বেদনার আর এক দিকও

বেদনায়, এই পাছড়াপাছড়িতে তোমার চিত্তের মাংস-পেশীগুলি হৃষ্টপুষ্ট হইবে। কল্পনার হ্যামলেট-লীয়ার-সীজার-রোমীয়ো, বাস্তবের এ সবই তুমি নেপোলিয়ান,

"কোন্ অমানুষ
তোমার বেদনা হতে না পাইবে বল ?
মোছ্‌রে দুর্ব্বল চক্ষু, মোছ্ অশ্রুজল !"

যাহা হউক, ফরাসী জাতি আল্পস্ পর্ব্বতের শৃঙ্গে চূরমার হইয়া গেল—ফরাসীর মেরুদণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। ফরাসী ইউরোপের চিন্তায় untouchable pariah, অস্পৃশ্য, নিন্দিত, পদদলিত, চরিত্র-হীন, নীতি-ভ্রষ্ট সমাজে পরিণত হইল। তাহার দুর্দ্দশা বুঝিতে চাও? ভিক্টর হিউগোর 'লে মিজারব্‌ল্' পড়। আর ফরাসী উঠিল না, এখন ও উঠে নাই। ফরাসী ভাবুকতার হলাহল দেখিলে! এ গরল কে গিলিতে পারিবে ?

অমৃত ত সকলেই ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইয়াছেন। ইতালী স্বাধীন হইয়াছে—জার্ম্মাণি যুক্তরাজ্য হইয়াছে—ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছে—জাপানেও জাগরণ আসিয়াছে—সর্ব্বত্র সকল কর্ম্মে ও চিন্তায় নবযুগ দেখা দিয়াছে। কিন্তু ফরাসীকে কে রক্ষা করিবে? ফরাসী-বিপ্লবের বিষ ত কেহই পান করিতে চাহিতেছেন না! ফরাসীর সাধ্য নাই, ইউরোপের

হয়, যে দেশের কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মতত্ত্বের প্রচার হয়, যে দেশের সংসারে মুক্তির পথ দেখান হয়, সেই দেশের নীলকণ্ঠই এ হলাহল গণ্ডূষ করিতে পারিবেন।

এখনও দেরী আছে—ফরাসীর এখনও চৈতন্য হয় নাই—হতাশ হইয়া পড়িয়াছে—তুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে—মুখে রা নাই—তথাপি এখনও "প্রভাত-কিরণে সকাল বেলাতে মন লয়ে সখি গেছিনু খেলাতে,"—ঠিক যেন সেই ভাব! এখনও ফরাসী হিন্দুকে বুঝিল না—হিন্দুকে স্থান দেয় না—হিন্দুচরিত্রকে সম্মান করে না। জার্ম্মাণি হিন্দুকে সম্মান করিয়া থাকে, ইংরাজজাতিও সম্মান করিতে শিখিতেছে—কিন্তু জানিয়া রাখিও, ভারতবাসী ফরাসী এখনও তোমাকে বিদ্রূপ করিতেছে—সে হিন্দুর বাণী শীঘ্র বুঝিতে চেষ্টা করিবে না।

একজন রুশ ভাবুকের পরিচয় দিতেছি—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, বায়রণ, রুসো, ফরাসী-বিপ্লব, সংস্কৃত সাহিত্যের "আবিষ্কার," পাশ্চাত্য-জগতে গীতা-প্রচার—ইত্যাদির যুগ স্মরণ কর। সেই সময়কার রুশিয়ায় করমসিন (Karamsin ১৭৬৬-১৮২৬) একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসেবী। তিনি গদ্য পদ্য উভয় সাহিত্যেই স্মরণযোগ্য, একখানা জগৎ-প্রসিদ্ধ ইতিহাস-গ্রন্থের রচয়িতা—"European Messenger"-নামক সংবাদ-পত্রের সম্পাদক। তাঁহার আজীবন সাহিত্যসেবার দ্বারা নানা উপায়ে রুশিয়ার সমাজে, সাহিত্যে, শিল্পে, রাষ্ট্রে সর্ব্বত্র এক নবযুগ আসিয়াছিল—

তাঁহার বাণী শুনাইতেছি—

"Do you wish to be a writer? Read the history of the accumulated woes of your race; and if your heart does not bleed as you read, throw down your pen, let it only serve to betray the gloomy coldness of your heart."

তিনি কাঁদিতে জানিতেন, কাঁদাইতে পারিতেন। এই জন্য তাঁহার প্রভাব। তাঁহার Poor Louisa পড়, দরিদ্রের ক্রন্দন শুনিতে পাইবে, উনবিংশ শতাব্দীর রুশ ভাবুকতা বুঝিবে। তাঁহার জগদ্বিখ্যাত ইতিহাস-গ্রন্থের ভূমিকা পড়—ভাবুকতার একটা নূতন দিক বুঝিবে:—"One thing above all others we love, and we have but one desire; we love our country, and desire for its happiness ever greater than fame; we pray that it may never betray the fundamental law of its greatness, but that in accordance with the principles of our Government and of our holy religion it may become more and more closely united; that Russia may flourish for ages to come, as long as it is permitted to moral things to live upon this earth."

করমসিন জার্ম্মান্ ভাবুকগণের ভক্ত—সকল রুশ ভাবুকই

করমসিন গেটের শেষ কথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই—হিন্দুর অনন্তবোধ তাঁহার ধারণার বহির্ভূত ছিল। God alone can know God—ইহাই তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব। আগেই বলিয়াছি, "The proper study of mankind is man"—বিলাতের ডেঁপো কবি পোপের উক্তি। দেখিতেছি, ভাবুক করমসিনও সেই সেক্সপীয়র, সেই পোপ, সেই গেটে অপেক্ষা ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিলেন না! তাঁহার ভাবুকতায় "ততঃ কিম্" নাই।

এখন একবার পাতালে আসা যাউক—

"হোথা আমেরিকা, নব অভ্যুদয়,
পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্য বলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার ভূমণ্ডল টলে
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।"

ঠিক কথা—আমেরিকার যাহা কিছু সবই লম্বা চৌড়ায় বেশী, বহরে বড়। তোমরা যেখানে এক টাকা খরচ কর, উহারা সেখানে ৫০ টাকা খরচ করে—উদ্দেশ্য একই, কিন্তু কাজকর্ম্ম চাল-চলন, সবই বেশী বেশী। 'ইউরোপ' শব্দটাকে বড় করিয়া লিখ, 'আমেরিকা' কি বুঝিতে পারিবে। ঐ যে "নূতন করিয়া গড়িতে চায়," তাহা আর কিছু নয়—ইউরোপেরই এ পীঠ ও পীঠ মাত্র। সেই গ্রীক, সেই সেক্সপীয়র, সেই নেপোলিয়ান, সেই

বাদ-হীন দুরাশারাশি পুঞ্জীকৃত হইয়া আটলাণ্টিকের অপর পারে আমেরিকা নাম ধারণ করিয়াছে। ওখানে নূতন কিছুই পাইবে না—নূতনের মধ্যে সবই ফাঁপা, হাল্কা, ভাসা-ভাসা, ফোঁপড়া, তর্জ্জন-গর্জ্জন, বিজ্ঞাপন-প্রচার, অত্যুক্তি, Superlative Degree.

একটা কথা আছে "The poet wants a home." আমরা বলি—"জায়া চ গৃহিণী গৃহং," "প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাং," "অপুত্রস্য গৃহং শূন্যং"। গৃহস্থালী, পরিবার-পালন, সংসারযাত্রা, সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ, পশু-সেবা, অতিথি-সেবা, দেবসেবা, "পঞ্চ মহাযজ্ঞ"—এই সকল না থাকিলে সর্ব্বমুখী চরিত্র গঠিত হইবে কি দিয়া? শতধারায় হৃদয়ের বিকাশ হইবে কি দিয়া? প্রকৃত অনন্ত-বোধ জাগুক বা না জাগুক,—অন্তরের পিপাসা, প্রেম-ভালবাসা, স্বার্থত্যাগ, করুণা, দাস্যসখ্য, প্রীতি, স্নেহ—"গৃহিণী সচিবঃ সখা মিথঃ প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ"—এ সকল অন্তর্জগতের গভীর ভাব, গম্ভীর ভাব আসিবে কোথা হইতে? আমরা জানি কাব্যের অনেক লক্ষণ, তার একটা এই যে "কান্তাসম্মিততয়া উপদেশযুজে"। এজন্যই রবীন্দ্রনাথের 'মানস-সুন্দরী'।

কিন্তু আমেরিকাবাসীর ঘর নাই—বাড়ী নাই— পরিবার নাই —সমাজ নাই—দেশ নাই, অতীত নাই, ইতিহাস নাই। ঠিক ঠিক বুঝিয়া লও। তাহাদের অর্ব্বাচীন সভ্যতায় হোটেল

মেস্ আছে, রেলগাড়ী আছে—বড় বড় থামওয়ালা যোজনব্যাপী মালগুদাম্ নামে বিশ্ববিদ্যালয় বা ছেলের কারখানা আছে, একটি স্ক্রু টিপিলে ৫০০০ মাইল দূরের কল চালাইবার ক্ষমতা আছে—অহরহ গতায়াত্ আছে। উহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার nomad তাতার জাতি—স্থিতি নাই। The rolling stone never gathereth the moss. তাই হৃদয়ের সূক্ষ্মভাব, কবিত্ব, রসিকতা ওখানে গজিতে পায় না—সবই শুষ্কং কাষ্ঠং, ইট-কাঠ, কলকব্জা, সবই কর্কশ নীরস।

দেশই উহাদের এখনও জমাট বাঁধে নাই—যে যাহা পায় তাহাই করে, আমেরিকা মানব-জাতির "বারইয়ারিতলা," "কোম্পনীর নাগড়া"—সকলেই এক ঘা লাগাইতে পারে। ভারতবাসী, তোমরাও বেদ-বেদান্ত, উপনিষৎ, পুরাণতন্ত্র, মন্দির, মূর্ত্তি লইয়া হাজির হও, সাদরে গৃহীত হইবে। প্রকাণ্ড মাঠ-ঘাট পড়িয়া রহিয়াছে, জমি চষ, বসবাস কর—কেহ আপত্তি করিবে না। চেষ্টা করিবে কি ?

যাহা হউক, ওখানে অসংখ্য বৈচিত্র্য, অসংখ্য দলাদলি, অসংখ্য অনৈক্য, পরস্পর বিভিন্নতা—কেহ কাহাকে চিনে না। একতা বলিয়া পদার্থ তথা-কথিত "যুক্তরাজ্যে" কিঞ্চিন্মাত্রও জন্মে নাই। সকল বিষয়েই উহারা নাবালক শিশু জাতি।

উহাদের ভাবুকতা দেখিবে ? হুইটম্যান পড়—আমেরিকার যে বর্ণনা দিলাম ইঁহার রচনার সঙ্গে মিলাইয়া লও। চূড়ান্ত কথা

ইউরিপিডিস্, সেই পেরিক্লীস, সেই রুসো, সেই টকেভিল—এ পীঠ ও পীঠ—বিংশ-শতাব্দী আর অষ্টাদশ শতাব্দী, অথবা খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী। আগেই বলিয়াছি, লম্বা-চৌড়া বোল-চালওয়ালা ইউরোপের নাম আমেরিকা। রগড় দেখিবে—ফিলিপাইনের কথা মনে কর। হুইটম্যানের স্বজাতি উড্রো উইলসন আমেরিকার চূড়ান্ত ভাবুক! তিনি ব্যক্তিত্ববাদের পৃষ্ঠ-পোষক—তাহার অনেক পরিচয় আছে। তিনি যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট হইবামাত্রই বক্তৃতা দ্বারা ঘোষণা করিলেন—তাঁহারা ফিলিপাইনকে স্বাধীন করিয়া দিবেন। রোমীয়োর আকাঙ্ক্ষা, হ্যামলেটের দুরাশা, ফরাসীর ভাবুকতা যাহা—এই রাষ্ট্রনৈতিক মিষ্টিসিজম্, বা রোমাণ্টিসিজম্, এই কর্ম্মজগতের ভাবুকতাও ঠিক তাহাই। ফিলিপাইনকে স্বাধীন করা হইবে না—তোমাদের ডায়েরীতে লিখিয়া রাখ। "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া!" John Bull ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তোমাদিগকে যে এক "ম্যাগনা কার্টা" দিয়াছেন—তাঁহার মাস্তুত ভাই Brother Jonathanও ফিলিপাইনকে সেইরূপই একটা দলিল দিয়াছেন!

ভারতবর্ষ এরূপ অত্যুক্তি, লম্বাগলা, আস্ফালন জানিত না। ভারতবর্ষ অনৈক্য স্বীকার করে—ছোট-বড়, উচ্চনীচ ভেদজ্ঞান করে—যখন তখন যাহা তাহা বকে না—একটা অলীক ঐক্যের কথা, সাম্যের কথা প্রচার করে না। যতটা রয় সয়, যতটা সম্ভবপর, এই সসীম মানব-জগতে যতটা কার্য্যে পরিণত করা

সাম্য, ঐক্য প্রবর্ত্তন করে। এই অধিকারি-ভেদ, এই ঐক্য-বিশিষ্ট অনৈক্য, এবং অনৈক্যযুক্ত ঐক্য হিন্দুর পরকালবাদের ফল, অধ্যাত্মজ্ঞানের ফল, অতীন্দ্রিয় ধারণার অভিব্যক্তি।

এই অতীন্দ্রিয়ের ধারণা আমেরিকায় পাইবে না। এমার্সনের কথা বলিতে চাও? 'প্র্যাগম্যাটিজমে'র কথা বলিতে চাও? আগেই বলিয়াছি—আমেরিকা ইউরোপেরই ভাষ্য বা অনুবাদ মাত্র। সেক্সপীয়রের Positivism দেখিয়াছ, mysticism-বর্জ্জন দেখিয়াছ—তাহাই আমেরিকার pragmatism তত্ত্ব। আর এমার্সন? তিনি কার্লাইলের মার্কিন সংস্করণ—কার্লাইল জার্ম্মাণের ইংরাজী সংস্করণ—জার্ম্মাণ এমার্সন্ অর্থাৎ শোপেন-হোয়র ল্যাটিনের জার্ম্মাণ অনুবাদ। ল্যাটিনটা দারাসিকোর ফারসী হইতে তর্জ্জমা। আর, দারাসিকো ভারতের মূল প্রস্রবণ হইতে ব্রহ্মবিদ্যার পিপাসা মিটাইয়াছিলেন। প্রত্নতত্ত্বের নিয়মানুসারে সন তারিখ মিলিল কি না দেখিও না। বৈদান্তিক-চিন্তার ধারাটা বুঝিয়া লও। Yankee অধ্যাত্মবাদ বুঝিবে।

কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, পাশ্চাত্য জল হাওয়ায় হিন্দুর যীশুতত্ত্ব হজম হয় নাই—এমন কি ওখানকার সমাজে কার্লাইল, রাস্কিন, টলষ্টয়, শোপেনহোয়রেরা "একঘরে" হইয়া আছেন। এমার্স-নেরও সেই অবস্থা। ইঁহারা দুইজন চারিজন লোক বই লিখিয়া, গান গাহিয়া, ছবি আঁকিয়া অধ্যাত্মের দিকে, হিন্দু-মিষ্টিসিজমের দিকে, বৈরাগ্যের দিকে, বেদান্তের দিকে পাশ্চাত্য মানবকে টানিয়া

পারিবারিক জীবনে, তাঁহারা সেই বেদান্তবাদ, সেই সসীমে অসীম, ভোগে ত্যাগ কিছুমাত্র প্রবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য জগতের সমাজ, শিল্প পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম সবই Suffragette আন্দোলন, অবিশ্বাস এবং যুক্তিতর্কের কচকচানি, রেলগাড়ী টেলিগ্রাম, Struggle for existence, বাণিজ্যসংগ্রাম, সাম্রাজ্য-নীতি, 'মুখে বল্ ভালবাসি, অন্তরে গরলমাখা"—এই তত্ত্ব বরণ করিয়া লইয়াছে। এখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই।

বোধ হয় ভাঙ্গিবার সময় আসিয়াছে—কারণ এসিয়া জাগিয়াছে। ইউরোপ কাজেই তাহার পুরাতন বুলিগুলিকে একবার ঝাড়িয়া বাছিয়া নূতন সংস্করণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ফরাসী ত গতপ্রাণ—নবীন ইতালী-জার্ম্মাণির নূতন নূতন আশা বাড়িতেছে, বনিয়াদি ইংলণ্ডেরও পার্শ্বপরিবর্ত্তন কিছু কিছু দেখা যাইতেছে। আমেরিকাও নূতন কথা শুনিবার পথে আসিতেছে। তাহার ভাবুকত্ব এখনও আবেষ্টনের ধাক্কা খায় নাই—শীঘ্রই খাইবে। আমেরিকা এইবার হ্যামলেটের চৈতন্য লাভ করিবে। তাহার Monroe Doctrine আর টিকিল না! ফিলিপাইন সম্বন্ধেও শীঘ্রই তাহাকে ভাবুকতার রাজ্য ছাড়িয়া বাস্তবে নামিতে হইবে। জাপানের দৃষ্টি বড় লোলুপ। এদিকে নূতন প্যানামা খালের সঙ্গে প্রাচ্যের ভাব—হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমানের প্রভাব আমেরিকায় নবশক্তি আনিয়া দিবে।

এই নবশক্তির অন্যতম অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংহিতা।

একৃষ্টীমিজম্, বিচিত্র প্রকৃতিপূজা, বিচিত্র অধ্যাত্মবোধ দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়াছে। তাহাদের আর একবার সেই ষোড়শ শতাব্দীর Renaissance বা 'নব অভ্যুদয়ে'র পুনরাবৃত্তি হইতে চলিল। তাহারা আবার 'আমেরিকা আবিষ্কার' করিল! একটা নূতন জগৎ তাহাদের চোখে পড়িল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ আনিয়া দিয়াছিলেন "The light that never was on sea or land," জার্ম্মাণেরা আনিয়া দিয়াছিলেন বৃহৎ "Ideas," কার্লাইল আনিয়া দিয়াছিলেন 'Natural Super-naturalism' এবং Heroes বা "Great men,"এমার্সন আনিয়া দিয়াছিলেন "Representative men". কিন্তু তাহাতে ক্ষুধা মিটে নাই। এখন নূতন জগৎ চাই—নূতন প্রাণ চাই, নূতন দৃষ্টি চাই, নূতন আশা চাই—নূতন আলোক চাই।)

নূতন জগৎ আর কোথায় পাওয়া যাইবে? উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু সবই ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। "গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে" সবই ত প্রায় দেখা হইয়া গেল—ইউরেণাস নেপচুন রাহুকেতুর পরিবর্ত্তে নবগ্রহে বসিলেন—মার্সের সঙ্গেও ত আলাপ চলিতেছে! কিন্তু "কত চতুরানন মরি মরি যাওত ন তুয়া আদি অবসান" —সেই আদি-অবসান-হীনের পরিচয় কে দিবে? এই ভারতবর্ষ—

"এমন দেশটি কোথা ও খুঁজে পাবে না ক তুমি।
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি॥"

একলক্ষ কুড়িহাজার টাকা মূল্য ত কিছুই নয়—হিন্দুর নিকট পাশ্চাত্যের শিষ্যত্বই প্রকৃত মূল্য।

পশ্চিমা সাহিত্যের ভাবুকতায় অনেকক্ষণ কাটাইলাম। এখন কিছু পূরবী কথা কহি। পূরবী সাহিত্যে অনেকটা নিজের জিনিষই পাইব—সুতরাং বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু দুঃখের কথা—পূর্ব্বকে চিনি নাই, প্রাচ্যকে চিনিতে শিখি নাই—প্রাচ্যকে চিনাইবার কেহ নাই। একজন ছিলেন—এসিয়ার ঐক্যপ্রচারক, হিন্দু-বৌদ্ধের আত্মীয়তা-প্রবর্ত্তক, ভারতের সহৃদয় বন্ধু, প্রাচ্যের মর্ম্মকথা-প্রকাশক। সেই ভাবুক, চিত্রশিল্পী, দার্শনিক, কবি ওকাকুরাকে চিনিতাম। জাপানের সেই সুসন্তান আজ পরলোকে। তাঁহার উদ্দেশে এক ফোঁটা আঁখিজল ফেলি—ভারতবাসী, তোমরাও তাঁহাকে মনে রাখিও। জাপানী তাঁহাকে ভালবাসে নাই!

আর চিনিতাম উনবিংশ শতাব্দীর অশোক, ধর্ম্মপ্রাণ, স্বজাতি-বৎসল, প্রজারঞ্জক, জাপানের রামচন্দ্র, পরলোকগত মিকাডোকে।

"প্রজানাং বিনয়াধানাদ্ রক্ষণাদ্ ভরণাদপি।
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ॥"

তাঁহাকে জাপানের পিটার দি গ্রেট অথবা ফ্রেডরিক দি গ্রেট মনে করিতে পার। তাঁহার ভাবুকতায়ই জাপানে স্বার্থত্যাগ সুরু হয়—এসিয়ার জাগরণ আরম্ভ হয়।

আর একজন জাপানীকে চিনি—তিনি ভাবুক ওকাকুরার

ভাল হইত। তিনি বোধ হয় জাপানকে মজাইবেন—এসিয়াকেও ডুবাইতে বসিয়াছেন। "মজালে রাক্ষস কুলে, মজিলা আপনি।"

জাপানের আর কাহাকেও চিনি না—চিনিবার প্রয়োজন নাই। তাহারা একটা লড়াই করিয়া জিতিয়াছে। কিন্তু আজ তাহার আস্ফালনে এসিয়ার মুখ নিষ্প্রভ—সমস্ত প্রাচ্য জগৎ তাহার মত্ততায় নির্ব্বাক্। অধিক বলিয়া লাভ নাই। এ নেশা বেশী দিন টিকিবে না। শীঘ্রই তাহারা এসিয়ার মর্ম্ম বুঝিতে বাধ্য হইবে—আবার এসিয়ার পদতলে লুটাইয়া পড়িবে, এসিয়াকে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিবে। সে ডাকে এসিয়াবাসী সাড়া দিবে—ভাইকে ভুলিয়া থাকিবে না।

এখন পর্য্যন্ত জাপান জগৎকে কিছু দেয় নাই—ইউরোপের নকল করিয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতির দুর্ব্বলতার ফাঁকে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। একবার গা ঝাড়িয়া দাঁড়াইতে পারিলে কিছুদিন চলিয়া যায়! ইহা জগতের নিয়ম—বিজ্ঞানে ইহার নাম inertia. যাহা হউক, ভগবান্ যাহা করেন—মঙ্গলের জন্য—এসিয়া ত জাগিল।

মহাপ্রাণ চীনকে ভুলিও না। সে তোমাদের আত্মীয়—বহুদিনকার কুটুম্ব—এই সেদিনকার পালের বাঙ্গালায়ও তাহাদের সঙ্গে আমাদের লেন-দেন বেশ চলিত। চীন ভারতবর্ষকে বুঝে, জাপান দূরে পড়িয়া বেশী বুঝিল না। চীনা সাহিত্যে ভারতবর্ষকে পাইবে—ভারতবর্ষের ভাবুকতা বেশ পাইবে। কলিকাতার 'বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের' মুচি চীনাম্যানদের দেখিয়া চীন-

জাতিকে বুঝিও না। তাহাদের দেশে অনেক গভীরতত্ত্ব আছে। আর এই মুচি, কারিগর, শিল্পীদের মধ্যেও অনেক গুণ আছে। চোখ থাকিলে চিনিতে—মানুষ হইলে তাহাদিগকেও বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে।

চীন আমাদের আত্মীয় বটে—কিন্তু তাঁহাকে আমরা একেবারেই চিনি না। পাশ্চাত্যের একজন বলিয়াছেন—"Better fifty years of Europe than a cycle of Cathay." রামায়ণ চোখে না দেখিয়া তাহার সমালোচনা যাহা, চীনের মানচিত্র দেখিয়া তাহার অধিবাসী সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ সেইরূপ। অথবা একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছিলেন—প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা বলিতেছি—যে, "সংস্কৃত ভাষাটা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের একটা জালিয়াতি, সংস্কৃত ভাষা বাস্তবিক কোন একটা ভাষা নয়"! বুঝিলে—পাশ্চাত্যেরাও চীনকে এইরূপই বুঝিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের সস্তা সংস্করণ পড়িয়া "স পাপিষ্ঠস্ততোহধিকঃ" হইয়াছি।

এই সঙ্গে একটা অবান্তর কথা বলিয়া রাখি। পশ্চিমারা যখন আমাদিগকে নিন্দা করে, সে কথায় বেশী কাণ দিও না। আর যদি ভাল বলে, তাহাতেও গলিয়া যাইও না। সেই প্রশংসার সাহায্যে কাজ হাঁসিল করিবার উপায় বাহির করিও।

যাহা হউক, চীনের সাহিত্য বুঝিবার জন্য সত্বর চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তোমরা নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িতেছ—দেশের

জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি, ঐতিহাসিক-অনুসন্ধান-সমিতি, হিন্দুসাহিত্য প্রচার-পরিষৎ কত কি গড়িতেছ ? ভারতবাসীকে চীনের ধর্ম্ম চীনের সাহিত্য শিখাইবার কোন ব্যবস্থা করিতেছ না কেন ? পালি ভাষা দেশের পণ্ডিত-মহলে অন্ততঃ দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবার চীনাটাকে চালাও।

এখন কিছু মুসলমানের কথা বলিব। মুসলমানদের ভাবুকতা আছে—তাহা আমাদেরই ভাবুকতা—হিন্দুর ভগবদ্ভক্তি তাঁহারা পীর-ফকীরকে সম্মান করেন, তাঁহাদের বারমাসে তের পার্ব্বণ আছে। তাঁহাদের আজান-নামাজে অনন্তবোধ দেখ—আলমে, পরমেশ্বরে বিশ্বাস দেখ, নিজকে ভুলিয়া পরমেশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করিবার প্রবৃত্তি দেখ। অধিকন্তু ভারতের মুসলমান ভারতবর্ষের বাণী বহুকাল শুনিয়াছেন। মুসলমানী সাহিত্য, শিল্প, চিত্র, কায়দা-কানুন, সঙ্গীত—এ সবের মধ্যে আমাদের অনেক জিনিষ শিখিতে পাইবে। মুসলমানেরাও হিন্দু সাহিত্যে, শিল্পে, পূজা-পাঠে তাঁহাদের অনেক কথা শিখিতে পারেন। এজন্যই মুসলমান সাধুসন্তদের শ্রাদ্ধ-বাসরে, মহরমের জনতায়, রামলীলা-গম্ভীরা-ভরতবিলাপ ইত্যাদি উৎসবে হিন্দু মুসলমান একপ্রাণ হইয়া যায়। তারপর সুফীধর্ম্মের ভাবুকতা—সে ত আমাদেরই বৈষ্ণবধর্ম্ম। আরবী "লয়লা-মজনুনের" গল্প শুনিয়াছ ? দেখিবে—রাধার প্রেম কাহাকে বলে। মৃত্যু-কালে গজনীর মামুদ কাঁদিয়াছিলেন। কেন—ভাবিয়া দেখ।

রক্ত-পিপাসু গজনীর মামুদ সেজন্য কাঁদেন নাই। এই ক্রন্দন চিরন্তুর্ব্বলের আকুল ক্রন্দন—সসীম মানবের অসীমে প্রীতি—"তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম সুতমিত রমণী সমাজে"—সেই ধুয়া। উর্দ্দু ভাষায় সুপ্রচলিত এই ধুয়ারই একটা 'বয়েদ' শুন—

"নাসির ওঠ, কোমর কো বাঁধো,
বিস্তর্ কো উঠাও রাত রহে গেই থোড়ী।"

সংসার ছাড়িবার "সময় হয়েছে নিকট"—শেষ খেয়ায় পাড়ি দিবার বেলা হইল—"আপন রতন বেছে নেচে চল হরি ব'লে ডাকি"—মুসলমানেরা এ সব কথায় অভ্যস্ত।

কালিদাসের পরিপূর্ণ হিন্দুজগৎ

ভাবুকতার এক তরফা গাহিলাম—ইহার আর একদিক আছে। হিন্দুর ভাবুকতা কেবল আশার, আকাঙ্ক্ষার, বাসনার বিশ্বাসের সামগ্রী মাত্র নয়। হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা কেবল ভাব-রাজ্যের, চিন্তারাজ্যের, ধ্যান-ধারণার বিষয়ীভূত নয়। কেবল গ্রন্থ লিখিবার জন্য হিন্দু মুনিঋষিগণ একটা অধ্যাত্মবাদের, একটা অনাদ্যন্ত অতি-জগতের, জন্মমরণাতীত সংসারের সৃষ্টি করেন নাই। ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজই আধ্যাত্মিকতাময়। ভাবুকতার, অতীন্দ্রিয়তার, ভগবদ্ভক্তির দর্শনবাদ হিন্দুর বাস্তব জীবন হইতে উদ্ভূত, হিন্দুর প্রতিদিনকার কার্য্যকলাপে, প্রতি আচার-ব্যবহারে নিবদ্ধ। এই সকলের সাহায্যে মিষ্টিসিজম্‌কে আমাদের ঘরে গ্রামে সমাজে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। এই অনন্তবোধ হিন্দুর ভোগ-সংসার-গৃহস্থালীকে, বিবাহ-শ্রাদ্ধকে, রাষ্ট্র-শিল্প-সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করিয়া রহিয়াছে। আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, আমাদের রীতিনীতি, আমাদের জন্মান্তরবাদ, আমাদের পরকালবাদ, ধর্ম্মকর্ম্মের দিগ্বিজয়, আমাদের কৃষি, পশুপালন, ব্যবসায়, অতিথিসেবা, পল্লীসভ্যতা, আমাদের সঙ্গীত, মূর্ত্তিগঠন-কারুকার্য্য, আমাদের বৈরাগ্য, আমাদের ব্রহ্মচর্য্য, আমাদের গার্হস্থ্য, আমাদের বাণপ্রস্থ—জীবনের শারীরিক মানসিক সকল

অতীন্দ্রিয়তার সাক্ষী—আজও, এই অবনত ভারতেও, তাহার জীবন্ত প্রমাণ।

সেই জন্যই আমাদের কেবল উচ্চ অঙ্গের উপনিষদ্-গীতা-বেদান্ত আছে তাহা নহে। আমাদের সহজবোধ্য লোক-সাহিত্য মহাভারত-পুরাণ-তন্ত্র-সংহিতাও আছে। আমাদের কেবল যোগ, ধ্যান, সূক্ষ্মদৃষ্টি, অন্তর্দ্দৃষ্টি, নিষ্কাম কর্ম্ম, কৈবল্যপ্রাপ্তি, মুমুক্ষুত্ব ইত্যাদি অলৌকিক সাধন-তত্ত্ব আছে তাহা নহে—এই সমুদয়ের অতিরিক্ত, এবং এই গুলিকে সাধারণ জনগণের চিত্তে ও কর্ম্মে, অভ্যাসে ও জ্ঞানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমাদের লৌকিক অধিকারিভেদ, জাতিভেদ, মূর্ত্তিপূজা, সকাম সাধনা, ব্রত-আরাধনা, পূজাপাঠ, উৎসব-আমোদ, সঙ্গীত সবই আছে। আমরা অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিয়া থাকি—যেখানে সেখানে বেকুবের মত ডন-কুইক্সটের "লিবার্টি, ফ্রেটার্নিটি, ইকোয়ালিটি" জাহির করিয়া বেড়াই না। আমরা বৈচিত্র্য স্বীকার করি—অথচ ঐক্যকে, সাম্যকে বাদ দিই না। আমরা ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজনীয়তা বুঝি—অথচ 'ইন্দ্রিয়ারাম'কেই চরম মনে করি না! আমরা দেহকে অবজ্ঞা করি না, অথচ "দেহাত্মক-বুদ্ধিতে"ও মজি না।

সুতরাং হিন্দু ভাবুকতার সকল দিক বুঝিতে হইলে—ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মের, আমাদের জাতীয় আধ্যাত্মিকতার সম্পূর্ণ চিত্র দেখিতে হইলে কেবলমাত্র আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভক্তি, যোগ, নির্ব্বাণ, মুক্তি, অনন্ত, অসীম, ভূমানন্দ বুঝিলে চলিবে না।

সৌন্দর্য্যবোধ দেহকে, ইন্দ্রিয়কে, বাস্তবকে, positiveকে বাদ দিয়া, শিল্প-বিজ্ঞান-জড়পদার্থকে বিদায় দিয়া, ইহ জগৎকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, সংসারকে তুচ্ছ করিয়া বিকশিত হয় নাই। ভোগের দিক, রসের দিক, প্রবৃত্তির দিক, সমাজবন্ধনের দিক, রাষ্ট্রশাসনের দিক, শারীরিক শক্তির দিক, রসায়ন, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, জাহাজতত্ত্ব, আকরতত্ত্ব—সকলই হিন্দুর অধ্যাত্মজ্ঞানে তাহাদের যথানির্দ্দিষ্ট স্থান পাইয়াছে।

কাব্যে হিন্দু জগৎ দেখিবে—সাহিত্যে সোনার ভারত দেখিতে চাও—আধ্যাত্মিকতার দুই দিক—ভাবুকতার উভয় পক্ষ—হিন্দু সমাজের সনাতনী বাণী—উপলব্ধি করিতে চাও?—বিক্রমাদিত্যের কালিদাসকে গুরু কর। তাহার শকুন্তলা-মেঘদূত নয়, এমন কি কুমার-সম্ভবও নয়—রঘুবংশকে চিরসহচর কর। রঘুবংশের সমাজ, সংসার, গৃহস্থালী, রাষ্ট্রশাসন, রঘুবংশের আদর্শ, দর্শনতত্ত্ব, চিন্তাপ্রণালী, কর্ম্মপ্রণালী ধ্যান-করিবে। বুঝিবে তোমরা কি—তোমাদের প্রাণ কোথায়, বিশেষত্ব কোথায়—বুঝিবে প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্ম কাহাকে বলে, যথার্থ গৃহস্থ কাহাকে বলে, ধর্ম্মের জয় পাপের পরাজয় কাহাকে বলে। দিলীপ-রঘু-রামচন্দ্রের সাধনা বুঝিও—অগ্নিবর্ণের অধঃপতন বুঝিও—প্রজারঞ্জন, দেশহিত, পরোপকার বুঝিও—এবং এই নশ্বর জগতের শেষ কথাটা বুঝিও। রামচন্দ্রের অযোধ্যা "কষ্টাৎ কষ্টতরং গতা" কেন হইয়াছিল বুঝিও, পবিত্র

বারিবিন্দুসম" সবই অস্থায়ী—কিছুই থাকিবে না, যতই লাফালাফি কর, কিছুই টিকিবে না—এই তত্ত্ব বুঝিয়া জীবন গঠন করিতে শিখিও ; আর হিন্দুর ভবিষ্যতে বিশ্বাসটা বুঝিও—এই জন্য "রঘুবংশে"র ঊনবিংশসর্গের শেষ শ্লোকটা গভীরভাবে ধ্যান করিও—কেন অগ্নিবর্ণের সাধ্বীপত্নী "অন্তর্গূঢ়ং ক্ষিতিরিব নভোবীজমুষ্টিং দধানা" রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। সূর্য্যবংশ ছারখার হইল—তথাপি হিন্দু কবি আশা ছাড়িলেন না।

রঘুবংশের এই শেষ কথা—হিন্দুর চরম কথা—গীতার আশাতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতেছি—

"তব চরণের আশা, ওগো মহারাজ
ছাড়ি নাই ! এত যে হীনতা, এত লাজ,
তবু ছাড়ি নাই আশা !
তোমার নির্দ্দিষ্ট কালে
মুহূর্ত্তেই অসম্ভব আসে কোথা হতে।
আছ তুমি অন্তর্যামী এ লজ্জিত দেশে,
সবার অজ্ঞাত সারে হৃদয়ে হৃদয়ে
গৃহে গৃহে রাত্রি দিন জাগরুক হয়ে
তোমার নিগূঢ় শক্তি করিতেছে কাজ !
আমি ছাড়ি নাই আশা, ওগো মহারাজ !"

কালিদাসের কারিগরী—কালিদাসের জগৎসৃষ্টি দেখাইতেছি। কালিদাসে ভাবুকতার positive পক্ষ এবং transcendental

বাহুবলে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেন—দিগ্বিজয় করিয়া রোমীয় সৈনানায়কগণের ন্যায় অসংখ্য রাজা, মহারাজ, সামন্ত, মহাসামন্তকে বন্দী ও ভৃত্যভাবে ধরিয়া আনিলেন,—

''ইতি জিত্বা দিশো জিষ্ণুর্ন্যবর্ত্তত রথোদ্ধতম্।
রজো বিশ্রাময়ন্ রাজ্ঞাং ছত্রশূন্যেষু মৌলিষু ॥

—কিন্তু ধরিয়া রাখিলেন না—শীঘ্রই বিদায় দিলেন। সেই সকল উন্নতশির বীরগণের মস্তক রাজ-দরবারে প্রকাশ্য সভায় রঘুবীরের শ্রীচরণ স্পর্শ করিল—

তে রেখাধ্বজ কুলিশাতপত্রচিহ্নং
সম্রাজশ্চরণযুগং প্রসাদলভ্যং।
প্রস্থানপ্রণতিভিরঙ্গুলীষু চক্রুঃ
মৌলিস্রক্‌চ্যুতমকরন্দরেণুগৌরম্ ॥

ভোগের চূড়ান্ত—ক্ষাত্রধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা—সাংসারিকতার শেষ নিদর্শন! আলেক্‌জাণ্ডার, সীজার, নেপোলিয়ান তাঁহাদের কীর্ত্তি-বর্ণনার জন্য এরূপ স্তাবক এখনও পান নাই।

কিন্তু আমাদের ভারতীয় নেপোলিয়ান দিগ্বিজয়ের পর মুহূর্ত্তেই কি করিলেন জান? ইউরোপের হোমার হইতে এমার্সন-ইবসেন্ পর্য্যন্ত কাহারও মাথায় তাহা আসিবে না। পাশ্চাত্য ভোগী মানব-সমাজ, তাহা তোমার বোধগম্য হইবে না, কর্ণের ভিতর ঢুকিলেও মরমে পশিবে না। রঘুবীর শিখিয়াছিলেন—তোমাদের রেসিডেনশ্যাল মঠে বসিয়া নয়—গুরুগৃহে, ব্রহ্মচর্য্যা-

"ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাং।
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাং ॥"

দেদার টাকা রোজগার কর—কিন্তু কিসের জন্য ? কেবল দান। বেশী কথা বলিও না। "তাবন্ মুখশ্চ শোভতে যাবৎ কিঞ্চিন্নভাষতে !" মূর্খতা প্রকাশ হইয়া পড়িবে ! সেই ভয়ে ? তাহা নহে—পাছে সত্য হইতে দূরে সরিয়া পড় সেই কারণে সুসংযতবাক্ হইবে। অসংখ্য শত্রু জয় করিবে—কিন্তু ব্যক্তিগত আক্রোশ ও বর্ব্বরতার প্রশ্রয় দিও না। রোমীয় সেনানায়কেরা যে ভাবে বন্দিগণকে শকটের পশ্চাতে বাঁধিয়া লইয়া "triumph" করিতেন সে ভাবে নয়। "যশোধনানাং হি যশো গরীয়ঃ"—কেবল যশের জন্য, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মপালনের জন্য, আত্ম-সুখভোগের আকাঙ্ক্ষায় নয়। গৃহস্থ হইও—দার পরিগ্রহ করিও—কিন্তু বর্ব্বরোচিত পশু-স্বভাব নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়লালসায় নয়। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—পুত্রলাভ তোমার ধর্ম্মকর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বুঝিয়া রাখিও।

রঘুবীর সংসারে সন্ন্যাস, ভোগে বৈরাগ্য, প্রবৃত্তিতে নিবৃত্তির এইরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন। সুতরাং দিগ্বিজয়ের চূড়ান্ত বিলাসের পর—

"স বিশ্বজিত মাজহ্রে যজ্ঞং সর্ব্বস্বদক্ষিণম্।
আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব ॥"

এবং "[illegible]

ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্য দেখ—সসীমে অসীমের প্রভাব দেখ। বাস্তবে অতীন্দ্রিয়ের বিকাশ দেখ—Positiveএ mysticismএর আধিপত্য দেখ। "জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘাবিপর্য্যয়:" দেখ। সেক্সপীয়র mysticism বাদ দিয়া positive. কালিদাস পজিটিভ্ বাদ না দিয়া, পজিটিভ্‌কে সঙ্গে লইয়াই মিষ্টিক্। সেকসপীয়রে বাস্তব এবং অধ্যাত্মের বিরোধ দেখ, এবং শেষ পর্য্যন্ত বাস্তবের জয়লাভ দেখ। কালিদাসে এই দু'য়ের সন্ধি দেখ, সমন্বয় দেখ। সেক্‌স্‌পীয়রের উল্‌টা কালিদাস, কালিদাসের উল্‌টা সেক্সপীয়র। উহারা ইউরোপ্—আমরা ভারত।

রঘু এমন এক যজ্ঞ করিলেন—যাহার দ্বারা হাতে কলমে প্রমাণ করিয়া ছাড়িলেন "সব ধর্ম্ম মাঝে ত্যাগ-ধর্ম্ম সার ভুবনে।" সর্ব্বস্ব দান করিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করিলেন; দধীচির অস্থিদান এই ভারতেই হইয়াছিল। জনকরাজ, বুদ্ধদেব এই হিন্দুস্থানেই জন্মিয়াছিলেন। এই ভারতেই মহারাজ অশোক ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক সমগ্র বৈষয়িক রাজ্যকে ভগবদ্দত্ত দেবোত্তরমাত্র-রূপে পালনীয় মনে করিয়াছিলেন। এই হিন্দুস্থানের শিক্ষা-প্রভাবেই যীশু প্রাণ দিতে শিখিয়াছিলেন। এই ভারতেই হর্ষবর্দ্ধন, ধর্ম্মপাল, রাজেন্দ্র-চোল একাধারে নেপোলিয়ান্ ও যীশুখৃষ্ট—একাধারে সীজার ও পোপ—রাষ্ট্রবীর ও ধর্ম্মগুরু—

লিয়ান ফকির হইলেন ! দেখিলে ভাবুকতার দুইদিক—দেখিলে আধ্যাত্মিক আদর্শের জগৎগঠন। এই 'জীবন্মুক্ত' রাজার আর একটা চিত্র দিতেছি। বরতন্তু-শিষ্য কৌৎস গুরুদক্ষিণার জন্য ১৪ কোটি মুদ্রা ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন—এত আদায় করিবার জন্য কোথায় আর যাইবেন ? হিন্দুসমাজ রাজতন্ত্র—হিন্দুর রাজা বিদ্যা ও ধর্ম্মের একজন প্রধান 'সংরক্ষক' ও পরিপোষক। কৌৎস "বর্ণাশ্রমাণাং গুরবে" রঘুর নিকট আসিলেন—ফকিরে ফকিরে মিলন হইল। রঘু পূর্ব্বেই যে "মৃৎপাত্রশেষামকরোদ্‌বিভূতিং"—তাহা ত 'সমাবর্ত্ত'মান নবীন স্নাতকের জানা নাই। রঘু মাটির ভাঁড়ে করিয়া খুদকণা দান করিতে আসিলেন। ভিখারী দেখিল, ধনকুবের স্বয়ংই আজ "সর্ব্বত্যাগী শঙ্করে"র উপাসক—বর্ষার মেঘ আজ একেবারেই জলশূন্য ! এতএব—"আসি মশায়,

"স্বস্ত্যস্তু তে নির্গলিতাম্বুগর্ব্ভং
শরদ্‌ঘনং নার্দ্দতি চাতকোঽপি ॥"

ইহার নাম হিন্দুধর্ম্ম—হিন্দুজাতিভেদ—হিন্দুর বর্ণাশ্রম—হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা। আগে গভীর ভাবে বোঝ—দুইপাতা হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, প্র্যাগম্যাটিজম আর কার্লমার্কস্ পড়িয়া পাশ্চাত্য "ঋষি"র ভাবুকতায় মুগ্ধ হইও না !

হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্মের আদর্শ এই দেখিলে—হিন্দু কবির পূর্ণ ভাবুকতা দেখিলে—আদর্শ হিন্দু চিন্তাবীরের শিল্প-নৈপুণ্য, কারিগরি, জগৎসৃষ্টি দেখিলে। আমরা পূর্ব্বে অনেক-

উপলক্ষ্যে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা আবার বলিতেছি :—

"যে কোন উপায়ে বাস্তব জগতের অপদার্থতা ও নশ্বরতা প্রমাণ করিলেই হিন্দু সভ্যতা প্রকাশ করা হইল না। ইহসংসারকে হীন দেখাইলেই আধ্যাত্মিকতা প্রমাণিত হইল না। অঙ্গের সৌষ্ঠব নষ্ট করিলেই, শরীরকে ক্ষীণ ও অবসন্ন ভাবে আঁকিলেই ধর্ম্মপ্রাণতা ভাবুকতা ব্যক্ত করা হইল না। হিন্দুর 'শিল্পশাস্ত্রে' মাপজোকের খুঁটিনাটি বড় কম ছিল না। হিন্দুর 'শিল্পশাস্ত্রে' দেবদেবীর মূর্ত্তিগঠন বিষয়ে সামান্য মাত্র নিয়ম-ভঙ্গের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা ছিল। এখনও নগণ্য পল্লীগ্রামের রমণীরাও জানেন যে, মূর্ত্তিগুলিকে বিকৃত ভাবে গড়িলে শিল্পী ও গৃহস্থের প্রতি আরাধ্য দেবদেবীগণ অসন্তুষ্ট হন।

হিন্দুর বিচারে—শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্। হিন্দু বিষয়-কর্ম্মে অমনোযোগী ছিলেন না, সংসারকে, বাস্তবজগৎকে অবহেলা করেন নাই। পরিবারপালনকে, গৃহস্থধর্ম্মকে উপেক্ষা করেন নাই। হিন্দু ইন্দ্রিয়ের জগৎকে বিনষ্ট করেন নাই—তাহার উপর অতীন্দ্রিয়ের ছাপ মারিয়াছিলেন; হিন্দু ভোগকে বর্জ্জন করিতেন না, ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা, অনাসক্তির দ্বারা ভোগ-বাসনাকে শান্ত সংযত নিয়ন্ত্রিত করিতেন। হিন্দুর বিধানে মানবজীবনের সকল অভিব্যক্তিই—পার্থিব সকল অনুষ্ঠানই যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে। এইজন্য হিন্দুর পরকালবাদ অলীক ধারণা মাত্র ছিল না এবং হাওয়ায় হাওয়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত না।

হইত, ভোগের অনুষ্ঠানগুলিই আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত হইত, সমাজের সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠানই বৈরাগ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইত।

ইহার ফলে হিন্দুর ভাবুকতা, হিন্দুর সন্ন্যাসে, ব্রহ্মচর্য্যে, গার্হস্থ্যে, রাষ্ট্রে, শিল্পে, পল্লীজীবনে, সকলের অভ্যন্তরেই স্বকীয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কার্য্যতঃ সকল ক্ষেত্রে সন্ন্যাস ও সংসারের সমন্বয়, ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্য বিধান, অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্ধিস্থাপন, ইহাই হিন্দুর সনাতন সাধনা। তাই হিন্দুর আদর্শ-কবি কালিদাস হিন্দুর আদর্শ-গৃহস্থ-নরপতির জীবন চিত্রিত করিয়াছেন :—

"জুগোপাত্মানমত্রস্তো ভেজে ধর্ম্মমনাতুরঃ।
অগৃধ্নুরাদদে সোঽর্থমসক্তঃ সুখমন্বভূৎ।"

তিনি আত্মরক্ষা করিতেন, কিন্তু ভয়ের জন্য নয়; তিনি ধর্ম্মের নিয়ম পালন করিতেন—কিন্তু লোভের প্রভাবে নয়। তিনি সুখ ভোগ করিতেন,—কিন্তু অনুতাপের বশে নয়। তিনি ধন গ্রহণ করিতেন—কিন্তু আসক্তির জন্য নয়।

সুতরাং হিন্দুর সনাতন আদর্শে—আত্মরক্ষা, ধর্ম্মের নিয়ম পালন ও সুখভোগ—সকলেরই যথানির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। এই সকল জাগতিক, সাংসারিক ও বৈষয়িক কার্য্যাবলী হিন্দুর বিচারে গর্হিত ও নিন্দনীয় নহে।"

রবীন্দ্রনাথের অসম্পূর্ণতা

কবি-রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু ভাবুকতার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়াছি—কিন্তু তাঁহার কাব্য-নাট্য-হাস্য-গদ্যের মধ্যে (হিন্দু সমাজের পরিপূর্ণ অধ্যাত্মবাদের, হিন্দুর সনাতন সৌন্দর্য্যবোধের, উভয়পক্ষবিশিষ্ট ভাবুকতার পরিচয় পাইব কি ?

আমাদের বিশ্বাস কবিবর আমাদিগকে কালিদাস-বিবেকানন্দের ন্যায় প্রকৃত হিন্দুর আকাঙ্ক্ষা ও আশা দিয়াছেন, আমাদিগের হৃদয়ে অনাদ্যন্ত অসীমে প্রীতি জাগাইয়াছেন, উৎকট-বৈরাগ্যের শিক্ষা দিয়াছেন, ভবিষ্যতে জ্বলন্ত বিশ্বাস রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তিনি কিছু গড়েন নাই। তাঁহার প্রতিভার সীমা এইখানে।

(হিন্দু যেমন গড়িত তিনি তেমন কিছু গড়েন নাই। তাঁহার কাব্যে আমরা জীবনের আদর্শ পাইয়াছি—কিন্তু কিরূপ বৈষয়িক জগৎ গড়িয়া তুলিব—কোন্ সংসারে বাস করিব—সাধারণ গৃহস্থালীর মধ্যে ভাবুকতা, আধ্যাত্মিকতা, অতীন্দ্রিয়তা কি উপায়ে কতখানি প্রবেশ করিবে, সেই রাষ্ট্র-সমাজ-পরিবারের সকল অঙ্গের পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ থাকিবে সে সব কারিগরী তিনি শিখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না।) তাঁহার

সসীমে অসীম, গার্হস্থ্যে সন্ন্যাস, ভোগে ত্যাগের সংসারযাত্রা দেখিতে পাই না।

তাঁহার 'নন্দা' সাগরে যাইয়া অনন্ত সুখ পাইয়াছে জানি। কিন্তু নন্দার উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে 'শিশু'র যে curiosity, যে ব্যাকুল প্রশ্ন, সেই প্রশ্ন আমরা আমাদের ভারতীয় জীবন-গঙ্গার অনতিদূর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কবিবরের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি।

বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় "মহামিলনের," সেই সাগর-সঙ্গমের পরিপূর্ণ চিত্র তিনি আঁকিতে পারেন নাই। যাহা আঁকিয়াছেন তাহা তাঁহারই প্রচারিত আশা-বিশ্বাস-আদর্শের অনুরূপ হয় নাই।

হোমার একটা জগৎ গড়িয়াছিলেন—সফক্লীস ইউরিপিডিস গড়িতে জানিতেন—দান্তে গড়িয়াছিলেন—সেক্সপীয়র, মিল্টন গড়িয়াছিলেন। ইউরোপের শেষ কারিগর জর্জ্জ ইলিয়ট, টেনিসন ও গেটে।

ইঁহারা ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ গড়িয়াছেন—evolution-বাদের যুগ গড়িয়াছেন—জড়-বিজ্ঞানের যুগ গড়িয়াছেন—কর্ম্ম-বিজ্ঞানের যুগ গড়িয়াছেন। ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত এই যুগ চলিয়াছে—এখনও আর কিছু কাল টেনিসন-গেটে-ইলিয়টের বিজ্ঞান-কর্ম্ম-রাষ্ট্র-অভিব্যক্তিবাদময় যুগে পাশ্চাত্য জগৎ চলিবে। নূতন গড়া এখনও ওদেশে আরম্ভ হয় নাই—পুরাতন জগৎই এখনও চলিতেছে। কার্লাইলের প্রভাব স্থায়ী হয় নাই—ব্রাউনিঙ্গও ভাসিয়া যাইতেছেন। পাশ্চাত্য জগতে [illegible]

গঠনের এখনও দেরী আছে। ভাবুকতা, mysticism, আধ্যাত্মিকতা উহাদের সমাজের মজ্জায় ঢুকিতে দেরী লাগিবে। যীশু হইতে আজ ২০০০ বৎসর হইয়া গেল—এখনও ইউরোপ যথার্থ ভাবুক হইতে শিখিল না!

রবীন্দ্রনাথ গড়িতে পারেন নাই। তিনি হিন্দুর আদর্শ দিয়াছেন—বিংশশতাব্দীর ভারতীয় জনসাধারণের মুখে আধ আধ ভাষা দিয়াছেন। আমরা উড়িতে শিখিয়াছি—কিন্তু এখনও আস্তানা খুঁজিয়া পাই নাই। রবীন্দ্রনাথ একটা বিংশশতাব্দীর মহাভারত গড়িতে পারেন নাই। এই খানেই তাঁহার প্রতিভার সীমা।

কবি রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের জগৎ গড়িতে পারেন নাই—বিংশশতাব্দীর "রঘুবংশ" তিনি রচনা করিতে পারেন নাই। বিক্রমাদিত্যের যুগে কালিদাস হিন্দু সমাজের পূর্ণ প্রতিবিম্ব। কালিদাসের কাব্যে চতুর্থ শতাব্দীর পরিপূর্ণ হিন্দুত্ব দেখিতে পাইবে। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক হিন্দুর এক অর্দ্ধ—প্রথম অর্দ্ধ—আশার অর্দ্ধ—"ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশাভরা আহ্লাদে"—সেই অর্দ্ধ;—"আসিবে সেদিন আসিবে"—সেই অর্দ্ধ। অপর অর্দ্ধ কে পূরণ করিবে? বিংশশতাব্দীর হিন্দু মহাকাব্য ভারতের কোন্ কবিবর রচনা করিবেন?—এ কাব্য যে সমগ্র জগতেরই মহাকাব্য হইবে।

বোধ হয় সে জগৎ গড়িবার সময় আসে নাই। বোধ হয়

রবতকে তাহার সূচনা হইতেছিল। বোধ হয় সময় এখনও আসে নাই বলিয়া সেই মালমশলাগুলি রবীন্দ্রনাথে ছড়াইয়া পড়িয়া হীরার টুকরায় পরিণত হইল। রবি-দ্বিজেন্দ্র-মাইকেল-হেম-নবীন-বঙ্কিম-ভূদেবের যৌথ উত্তরাধিকারী কে হইবে ? বিংশ-শতাব্দীর বৈরাগ্য-বিজ্ঞানাবতার পূর্ণ-কলিদাসকে কবে আমরা মাথায় করিয়া নাচিব ?

যে শক্তি লইয়া কালিদাস জন্মিয়াছিলেন, সেই শক্তি লইয়াই রবীন্দ্রনাথ জন্মিয়াছেন। নিজ মানস-সুন্দরীর প্রতি কালিদাসের যে ভক্তি ছিল—তাঁহার জীবনদেবতার প্রতি, রাজ-রাজের প্রতি -রবীন্দ্রনাথেরও ঠিক সেই ভক্তি রহিয়াছে। কালিদাসে ও রবীন্দ্রনাথে চিন্তার হিসাবে, আদর্শের হিসাবে তফাৎ করিতে পারিবে না। কালিদাস ভারতবর্ষকে, হিন্দুত্বকে যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথও ঠিক সেই রূপই বুঝিয়াছেন। দুইজনেই ~~সসীম~~ অসীমকে সমান ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, Positiveযুক্ত Mysticismকে, বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত ভাবুকতাকে একই প্রণালীতে ধরিতে পারিয়াছেন। 'রঘুবংশে'র মূলমন্ত্রের কিছু পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। এখন দেখ সেই মূলমন্ত্র রবীন্দ্রনাথে কিরূপ প্রকাশ পাইয়াছে :—

"হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, ভূমি,
ধরিতে দরিদ্রবেশ ; শিখায়েছ বীরে

ভুলি জয় পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্ম্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্ব্ব কর্ম্মস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার !
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্ম্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্য কর্ম্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে !"

এই তত্ত্বেরই ক্ষীরটুকু, এই উভয়-পক্ষবিশিষ্ট ভাবুকতার সারাংশ কথঞ্চিৎ দার্শনিক ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে—"ধূপ আপনারে মিলাইতে চায় গন্ধে"—সেই কবিতায়।

"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ—
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।"

ইহা হেঁয়ালি নয়—বুজরুকি নয়—দুর্ব্বোধ্য অলীক অস্পষ্টতা নয়। এই 'রূপে' অরূপ এবং সসীমে অসীম 'রঘুবংশে'র বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত ভাবুকতা—হিন্দুর খাঁটি স্বদেশী মিষ্টিসিজম—হিন্দু-সমাজের জাতিভেদ ও বৈদান্তিক সাম্য, মূর্ত্তিপূজা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। "ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং" শ্লোকটা আর একবার ধ্যান কর।

এই তত্বকে রঘুবংশের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা মনে করিও, এবং "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের বিস্তৃত ভাষ্য রূপে গ্রহণ করিও।

রবীন্দ্রনাথে ও কালিদাসে ঊনিশবিশ করিও না। কালিদাস একটা হিন্দুর সম্পূর্ণ সংসার—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের সংসার গড়িয়া ছিলেন—রবীন্দ্রনাথ তাহা গড়েন নাই। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান-ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের সমাজ-জীবন গড়েন নাই। এই প্রভেদ। যদি আর কোন প্রভেদ দেখিয়া থাক—তাহা হইলে সেটুকু চতুর্থ শতাব্দী আর বিংশ শতাব্দীর প্রভেদ, এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের কায়দায় এবং বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের কায়দায় প্রভেদ। যদি তাহার উপর আর কিছু প্রভেদ দেখ—তবে বলিব—তুমি কালিদাসকে ত বুঝই নাই, রবীন্দ্রনাথকেও বুঝিলে না। বোধ হয় ভারতবর্ষকে তুমি কোন দিনই বুঝিবে না। দুর্ভাগ্য আমরা !

শেষ কথা

এখন আমরা কাব্যামোদী পাঠকগণকে একটি কথা বলিয়া বিদায় হইব। কাব্যের সমালোচনা, সাহিত্যের রসবোধ ইত্যাদির অর্থ কোন লেখককে বা কোন ব্যক্তিবিশেষকে নিন্দা বা প্রশংসা করা নহে। সুতরাং সেই ব্যক্তিবিশেষের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন তথ্য জানা নাই—এইভাবে সাহিত্য-সমালোচনায় অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। আজ কালিদাস জয়দেব চণ্ডীদাস কাশীরামকে ভারতবাসীরা যে নিরপেক্ষ চোখে দেখিতেছেন, সেই চোখেই বঙ্কিম-মাইকেল-হেম-নবীন-দ্বিজেন্দ্রলাল-রবীন্দ্রনাথকেও সেইরূপ সমালোচনার বস্তুভাবেই দেখিতে হইবে। ইহাঁদের জীবন বৃত্তান্তের যেটুকু ঐতিহাসিক তথ্য আমরা জানি সেইগুলির সাহায্য লইয়া তাঁহাদের রচনা মাত্র বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাঁহাদের মনুষ্যত্বের, মতামতের, দোষগুণের, চরিত্রবত্তার দিক হইতে যে সকল কথা উঠিবে তাহা অন্যান্য কারণে অতি প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যসমালোচনা হিসাবে অবান্তর।

কিছুকাল হইতে পশ্চিমদেশে সমালোচনার মজলিসে 'Art for Art's sake-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে। তাঁহারা বিবেচনা করেন—কাব্য, সাহিত্য, কারুকার্য্য, চিত্র, শিল্প ইত্যাদির দ্বারা ধর্ম্মের উন্নতি হইতেছে কি অবনতি হইতেছে তাহা জানিবার

হইতেছে তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই। বই পড়িতেছ পড়, ছবি দেখিতেছ দেখ—এসব বেশী তলাইয়া দেখিও না—সমাজের উপর ইহাদের কি প্রভাব তাহা আলোচনা করিও না।

আমরা এ মতের পক্ষপাতী নহি। আমরা সমালোচনা-বিজ্ঞানের যে সূত্র প্রচার করিলাম তাহাকে ইংরাজী বুক্‌নিতে বলা যাইতে পারে—'Art, not Artist' অথবা 'Principle, not Person.' অর্থাৎ কাব্যকে, সাহিত্যকে, মতবাদকে, ভাস্কর্য্যকে, চিত্রকে গভীরতম ভাবে বুঝ—তলাইয়া মজাইয়া বোঝ—ইহাদের ভিতরকার কথা টানিয়া বাহির কর—সমাজের উপর, দেশের উপর, ধর্ম্মের উপর এইগুলির প্রভাব ভাল কি মন্দ তাহা অবশ্যই 'যাচাইয়া,' খুব কঠিন কষ্টিপাথরে কষিয়া দেখ। কিন্তু যে লোক ছবি আঁকিয়াছেন, যে গুণী কবিতা লিখিয়াছেন, যে সাহিত্যশিল্পী সাহিত্যসৃষ্টি করিতেছেন তাঁহার ব্যক্তিত্ব, জীবনযাপন ইত্যাদি জানিবার জন্য বেশী উদ্‌গ্রীব হইও না।

সাহিত্যসেবী সম্বন্ধে আমাদের এই মত—কিন্তু ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, জননায়ক প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের মত স্বতন্ত্র। তাহা আগে বলিয়াছি।

আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনা করিলাম না। কবি-হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে চিনিতে চেষ্টা করিলাম। প্রকৃত সমালোচনা করিতে হইলে দেশের কথা, বিদেশীয় সমাজের কথা, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কথা, আমাদের ভবিষ্যতের কথা,

ক্রমবিকাশের কথা ইত্যাদি জগতের সকলপ্রকার ভাব ও কর্ম্ম-শক্তির পরিচয় দিতে হইত। সেই শক্তিপুঞ্জের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব কোথায় এবং মনুষ্যত্ব কোথায় তাহা বিশ্লেষণ করিতে হইত। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্বন্ধে সেরূপ ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও তুলনা-মূলক সমালোচনার সময় ইহা নয়। এমন কি বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-ভূদেব-নবীন সম্বন্ধেও এরূপ 'প্রাণ-বিজ্ঞানে' প্রতিষ্ঠিত এবং 'সমাজ-বিজ্ঞানে' প্রতিষ্ঠিত সমালোচনার সময় আসে নাই। কাজেই এখন আমরা রবিবাবুর কাব্য-শিল্পের কয়েকটা মোটা কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

কবিহিসাবে রবীন্দ্রনাথ চূড়ান্ত ভক্ত, কবিহিসাবে রবীন্দ্রনাথ চূড়ান্ত শাক্ত, কবিহিসাবে রবীন্দ্রনাথ চূড়ান্ত প্রেমিক। কবিহিসাবে রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যের ন্যায় অসীমের ও ভূমানন্দের উপাসক। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের ন্যায় স্বদেশভক্ত—সর্ব্বত্যাগী শঙ্করের পূজাপ্রবর্ত্তক। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবের প্রতিমূর্ত্তি—প্রকৃতি-রাজ্যের প্রজা—পল্লীরাণীর ভৃত্য—স্বাধীনতার চারণ।

আর যদি ভারতবর্ষ কখনও বিক্রমাদিত্যের গৌরবযুগ ছাপাইয়া উঠিয়া জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে মাথা তুলিতে পারেন—সেদিনকার ভারতবাসী ভারতবর্ষকে কালিদাসের জন্মভূমি অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমি বিবেচনা করিয়া গৌরব করিবেন;—সেদিন

জাতীয় জীবন ভবিষ্যতে যেরূপ দাঁড়াইবে তাহার উপরই কালিদাস-রবীন্দ্রনাথের তুলনা ও আসন-বিভাগ নির্ভর করিতেছে।

লেখক যতক্ষণ মরজগতে জীবিত থাকেন ততক্ষণ তাঁহার ব্যক্তিত্বের অন্যান্য দিক্ তাঁহার সাহিত্যসেবার উপর পাঠকগণের একটা প্রীতি বা অপ্রীতি না আনিয়া যায় না। ততক্ষণ, 'Art, not artist'—'কবির কাব্য দেখ, ব্যক্তিত্ব দেখিও না'—এই তত্ত্ব সুপ্রচলিত হওয়া কঠিন। লেখকের পক্ষেও সেই ব্যক্তিত্বকে চাপিয়া রাখিয়া জনসাধারণের মতামত আকৃষ্ট করা অসম্ভব। সেই অবস্থায় স্বয়ং কবিই ত্রুটি স্বীকার করিয়া বলিতে বাধ্য হনঃ—

"দুর্ব্বল মোরা কত ভুল করি,
অপূর্ণ সব কাজ!
নেহারি আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতা
আপনি যে পাই লাজ।
তা বলে' যা পারি তাও করিব না?
নিষ্ফল হব ভেবে?
প্রেম ফুল ফোটে, ছোট হ'ল ব'লে
দিবনা কি তাহা সবে?"

কিন্তু ব্যক্তিত্ব মানুষের চিরকাল থাকে না—ব্যক্তিত্বের প্রভাব জনসমাজ হইতে জীবনলীলার সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হইয়া যায়—

"তুমিও রবে না আমিও র'ব না
দুদিনের দেখা তরে।"

লাজ-দুঃখের সংসার এবং কর্ত্তৃত্বাকর্ত্তৃত্বময় নশ্বর জগতের অতীত হন, যখন তিনি মানুষের হিংসা-দ্বেষ-প্রীতি-সৌহার্দ্দ্যের দান শরীরি-ভাবে গ্রহণ করিতে অসমর্থ, তখন, বলা বাহুল্য, এ সঙ্কোচ বোধ করিবার কেহ থাকেন না—কর্ত্তৃত্বাভিমান লইয়া কাহাকেও বিব্রত হইতে হয় না, নিন্দা প্রশংসার প্রভাবে কাহারও চিত্তবিকারের উদ্ভব হয় না। সেই সময়ে সমাজের ভবিষ্য সন্তানগণ "Art, not artist"-তত্ত্ব নিরপেক্ষভাবে বুঝিতে পারে,—দেশবাসীরা কোন সাময়িক উত্তেজনার প্রভাব অতিক্রম করিয়া বিশ্বাস করিতে পারে—

"কত প্রাণ পণ, দগ্ধ হৃদয়,
বিনিদ্র বিভাবরী,
জান কি বন্ধু উঠেছিল গীত
কত ব্যথা ভেদ করি ?
রাঙ্গা ফুল হ'য়ে উঠিছে ফুটিয়া
হৃদয়-শোণিতপাত,
অশ্রু ঝলিছে শিশিরের মত
পোহাইয়ে দুখরাত।
জীবনে যে সাধ হয়েছে বিফল
সে সাধ ফুটেছে গানে।"

রবীন্দ্রনাথের কাব্য যখন সেই 'সমালোচনা-বিজ্ঞানে'র যুগে আসিয়া উপস্থিত হইবে—তখন ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও সমা-

কর্ম্মবীর, বিজ্ঞানবীর ও সাহিত্যবীর দিগের পরস্পর-সুসম্বন্ধও পরস্পর-প্রভাব বিশ্লেষণ করিয়া নব্যভারত-গঠনে প্রত্যেকের কৃতিত্ব বিচার করিবেন, দেশের ও জগতের ভাবুকগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, এবং স্বীকার করিবেন, যে রবীন্দ্রনাথ নিজ কাব্য সমালোচনা নিজে যেরূপ করিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য ঃ—

"কোন ফুল যাবে দুদিনে ঝরিয়া
কোন ফুল বেঁচে রবে।
কোন ছোট ফুল আজিকার কথা
কালিকার কানে কবে।
হয়ত এ ফুল সুন্দর নয়,
ধরেছি সবার আগে,
চলিতে চলিতে আঁখির পলকে
ভুলে কারো ভাল লাগে।
যদি ভুল হয় ক'দিনের ভুল!
দুদিনে ভাঙ্গিবে তবে।"

সমসাময়িক সাহিত্যসেবিগণ, সেই ভবিষ্যৎ ভারত-সমাজের সমালোচনায়, সেই 'Art, not artist'-তত্ত্বের নিয়মানুসারে রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল্য কি হইবে তাহা যদি এখনই কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলেই আপনাদের কাব্য-রসজ্ঞতা সার্থক হইল। সমসাময়িক স্বদেশবাসিগণ, আমাদের বংশধরেরা

যে সকল মন্ত্র বেদবাক্যের ন্যায় জপ করিবে, তাহা যদি এখ হইতেই নিরপেক্ষ ভাবে আপনারা বাছিয়া লইতে পারেন, তবে আপনাদের অভিভাবকত্ব সফল হইবে। সে শক্তি ও সে নিরপেক্ষতা যদি না থাকে তাহা হইলে বৃথা আমাদের সাহিত্য সাধনা, বৃথা আমাদের স্বদেশ-সেবা, বৃথা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য দায়িত্ববোধ।

সমাপ্ত